বদিন মজুমদার
প্রিয়বরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

দত্তাভিলায় এক আগন্তুক
চন্দ্রকিরণে এক আততায়ী
হৃদয়ের শব্দ
পেরিয়ার অরণ্যের যাত্রী
আর এক জীবনে
গল্প সমগ্র (১)
শামখোল

১

এখন এই নির্জন মধ্যরাতে সব কিছুই কেমন অদ্ভুত লাগে।

কেউ কোথাও নেই। জ্যোৎস্নায় প্লাবিত যেন বিশ্ব চরাচর। দূর থেকে কোনও এক রাতপাখির ডাক আসছে থেকে থেকে। তার মধ্যে শহর প্রান্তের এই বাগান ঘেরা দোতলা বাড়িটা কেমন আশ্চর্য থমথমে আর নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে।

চাঁদের আলোয় মোমের মতো সাদা আর বিষন্ন চেহারার একটা বাড়ি। কোথাও কোনও মানুষের সাড়া নেই।

চারদিকে শুধু সোঁ সোঁ করা চাপা হাওয়ার শব্দ। মাতাল হয়ে ওঠা ঝিঁঝিদের ডাক। ঝাঁও—ঝাঁও—ঝাঁও—। বাতাসেই যেন বুকভরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে কেউ। হঠাৎ চমক লাগে যেন। তাকিয়ে দেখতে হয় আশেপাশে। না, কেউ কোথাও নেই। হয়তো কোনও অশরীরী আত্মা! এই অলৌকিক মায়াবী পরিবেশের সঙ্গেই মিশে আছে। তারই নিঃশ্বাস! ঝিঁঝিদের ডাকে, হাওয়ার শব্দে।

বাগানে গাছের মাথাগুলো দুলছে। জ্যোৎস্নার ঢল নামা সুন্দর সাজানো একটি উদ্যান। সারিবদ্ধ ভাবে লাগানো শাল, জারুল, গুলমোহর, ইউক্যালিপটাস···।

লাইন বেঁধে চলে গেছে আরও অনেক দেশি-বিদেশি দুর্লভ জাতের বৃক্ষ। প্রতিটিই পরিকল্পিত ভাবে সুবিন্যস্ত, সাজানো। আপাতত চাঁদের আলোয় আর্দ্র সবুজ, আর অপার্থিব এক রূপ ধারণ করে আছে।

একটু নজর করলেই বোঝা যায়, এই উদ্যান ও প্রতিটি বৃক্ষের পিছনে কোনও এক বৃক্ষ প্রেমিকের সযত্ন পরিচর্যার চিহ্ন বিদ্যমান।

এদিকে কম্পাউণ্ডের বাইরে ধু-ধু ফাঁকা মাঠ। ধোঁয়াটে চাঁদের আলোর মধ্যে মথ উড়ছে একদল। এলোমেলো ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। ঝাপটা দিয়ে উঠছে নামছে। মাটির গন্ধ নিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর তির তির করে কাঁপছে। একদল

আবার উড়তে উড়তে ঝাঁক্ করে ঢুকে পড়ল বাড়িটার মধ্যেই। ঘন গাছগাছালির আড়ালে, আলো অন্ধকারের জাফরিতে।

তবু দেখা যায় বিন্ বিন্ করে উড়ছে ওরা। একটা ঝাঁকড়া পাতাবাহারের মাথা ঘিরে পাক খাচ্ছে পাগলের মতো।

আর তার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন কোনও স্বপ্ন দেখছে ধবধবে সাদা চেহারার বিষণ্ন বাড়িটা। মাথার ওপরে নিস্তব্ধ নিঝুম রুপোলি আকাশ।

বাড়িটা একা নয়। ওপরের দোতলায় পুবপ্রান্তের নির্জন প্রকোষ্ঠেও একজন। সে দেবযানী। প্রায় সারারাত ধরে ভাঙা ভাঙা আধোঘুম আধোজাগরণের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে চলেছে। একটি পুরুষকেই দেখছে বারবার। সুমন্ত্র! বলিষ্ঠ, দুরন্ত আর ভীষণ পুরুষালি। একটু আগেই সে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

স্পষ্ট দেখছিল তাকে। বুক খোলা রঙিন চেক শার্ট, হাসি হাসি মুখ, ঘন ভ্রূযুগলের নীচে আবেশে নিবিড় হয়ে ওঠা বড় বড় চোখ···। শক্ত লোমশ কব্জিতে চওড়া স্টিলের ব্যান্ড হাত তুলে দূরের দিকে ইশারা করল তাকে, কী বলল অস্পষ্ট ভাষায় বিড়বিড় করে···। তারপরই কোথায় মিলিয়ে যায়। পাতলা মেঘের মতো এক ঘুমের পর্দা এসে আড়াল করে সব কিছু।

কিন্তু একটুক্ষণের জন্যেই। তারপর আবার দেখল। সে একা দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের ধারে। পাশে সুমন্ত্র নেই। চারদিকে নিবিড় বনভূমি। হা—হা—শব্দ হাওয়ার। বুকের মধ্যে কাঁপে যেন। হঠাৎ অনুপমের কণ্ঠস্বর শোনা গেল জঙ্গলে। অনুপম! সুমন্ত্রকে ডাকছে সে গলা তুলে, সমুদা—এই স—মু—দা— ···।

কেউ সাড়া দেয় না। ঘুমের মধ্যেই কান পেতে থাকে দেবযানী।

হঠাৎ মোটর বাইকের আওয়াজ সুমন্ত্রর। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। প্রচণ্ড ভারি আর গম্ভীর নির্ঘোষ। কিন্তু কাছে আসতে না আসতেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল শব্দটা। বুকের মধ্যেই তার তোলপাড় করা এক ঢেউ···

পরক্ষণেই আবার ঘুমটা ভেঙে গেল দেবযানীর। জেগে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকে। অন্ধকারের মধ্যে হিজিবিজি দৃশ্যগুলো এখনও ভেসে বেড়ায় চোখের সামনে। ছায়া মূর্তির মতো আরও অনেক-গুলো মানুষ। নিঃশব্দে আসছে, যাচ্ছে, কেউ কোন কথা বলছে না…

দেবযানী একা একা অসহায় ভাবে পড়ে থাকে। কতদিন এমনি হয়! কেউ জানে না। কাউকে সে বলতেও পারে না।

বাইরে পল্ ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে। বাগানে কিছু একটা দেখেছে হয়তো। গম্ভীর গমগমে আওয়াজ। এমনিই সে ডাকে।

দেখতে দেখতে পাঁচ বছর ছাড়িয়ে গেল পলের বয়েস। এনেছিল যখন এইটুকু একটা তুলতুলে বাচ্চা। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

দেবযানীর হাতে দিয়ে সুমন্ত্র বলেছিল, কী দেবী? এবার খুশি তো।

—ওহ্ খুব সুন্দর! থ্যাঙ্ক য়ু সো মাচ!

বলেই উচ্ছ্বসিত দেবযানী আদর করতে থাকে বাচ্চাটাকে। তখনও রঙটা ফোটেনি ভাল করে। তবু পেটের দিকটায় হলদেটে মসৃণ একটা আভা। ওপরে কালো। অ্যালসেশিয়ান। শেফার্ড ডগ, দেখতে দেখতেই জোয়ান হয়ে উঠবে। তবু যেন তাদের বাড়ির ক্ষুদে টিবেটিয়ান পিগির কথাটা মনে পড়ে। তাদের আদরের পিগি!

সেই পল একটু একটু করে কী বড় হয়ে উঠল। রোজ নিজের হাতে খাওয়াত দেবযানী। পায়ে পায়ে ঘুরত নীচে নামলেই। ওপরেও উঠে আসত বারান্দায়। সব সময় যেন এক ছটফটানি তাকে দেখলে।

আর ছিল দুরন্ত খেলার নেশা।

রোজ সকালে তাকে নিয়ে মাঠের মধ্যে খেলা সুমন্ত্রর। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—একদিনও কামাই নেই। আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়েছে দুজনে। দুজনেই ছুটছে। মাঝে মধ্যে পলের উল্লাস—উফ্—উফ্…।

সঙ্গে সুমন্ত্রর গমগমে গলা—প-অ-ল, কাম অন, গো-ও—

বলতে বলতে হাতের টকটকে লাল বলটা কোথায় কতদূরে ছুঁড়ে ফেলছে। সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে পিছলে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে বলটা। পিছনে নেকড়ের মতো লাফিয়ে চলেছে পল—উম্ম্-উফ্-উফ্-। যেন শিকার ধরতে চলেছে বাঘটা। অদ্ভুত এক দৃশ্য!

হামলে পড়ে বলটা কামড়ে ধরতেই মুখের উত্তেজিত গর্জনটা থেমে যায়। এক ছুটে বলমুখে আবার ফিরে আসে প্রভুর কাছে। চোখ দুটো খুশিতে চকচকে। মুখ তুলে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে সুমন্ত্রর দিকে। আবার ছুঁড়তে হবে বলটা। এখনই। যেন আর তর সইছে না। লেজটা নাড়ে ঘন ঘন। সুমন্ত্রের মুখে দুষ্টুমি ভরা হাসি···

দেখতে দেখতে কখন ঘন রোদে ভরে উঠল মাঠটা। ফুলে ভরা কাঞ্চনের ডালটা নুয়ে পড়েছে সামনে। এপাশে ঝাড়ালো দুটো ঝাউ। তার মধ্যেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শিশির ভেজা সবুজ মাঠটা রোদ্দুরে জ্বলজ্বল করছে। ফর্সা মুখটা টকটকে লাল সমুন্ত্রর। ঘামছে। চুলগুলো এলোমেলো। তবু কোনও খেয়াল নেই। মেতেই আছে পলের সঙ্গে সেই খেলায়।

ঘড়ি দেখেই পটে চায়ের পাতা ভিজিয়েছে দেবযানী। একটু-ক্ষণ অপেক্ষা করে, ইশারা করে বারবার মাঠের দিকে। সুমন্ত্র দেখছে না।

বারান্দা ছেড়ে অগত্যা নীচেয় নামে। দু-পা এগিয়ে আবার ইশারা করে হাত তুলে, এই, শুনছো···এই···

পল আর তার প্রভু দুজনেরই লক্ষ পড়ে একসঙ্গে।

এক ছুটে পলই দৌড়ে আসে আগে। বলটা মুখে করে এনে তার পায়ের কাছেই নামিয়ে রাখে। খেলা পাগল, অবুঝ, নীলচে বাদামি রঙের দুটো চোখ। চামরের মতো লেজটা স্থির। মুখ তুলে দুপায়ে ভর দিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন আবদার করে নিঃশব্দে বলছে কিছু।

দেবযানী ভ্রূ কুঁচকে হাসে, খুব হয়েছে ; আর খেলতে হবে না।

বোসো এখানে। একদম চুপচাপ—।

মাথা চাপড়ে আদর করে একটু। দুখানা বিস্কুট এগিয়ে দেয় সামনে। পল তবু তাকিয়ে আছে। আরও আদর খেতে চায় যেন।

সুমন্ত্র পাশ থেকে হেসে উঠল হো-হো করে।

বলল, দেখছ দেবী, তোমার ডিম্যান্ডটা!

—দেখছি। দেবযানী আবার থপ থপ করে মাথাটা চাপড়ে দেয়।

—তোমার সঙ্গে একবার না খেললে বোধ হয় মন উঠছে না বাবুর।

—নাহ্ আর নয়। অনেক হয়েছে—। দেবযানী লিকারটা ঘুঁটতে ঘুঁটতে মাথা নাড়ে।

চা পাতার সুগন্ধে ভরে উঠছে হাওয়া।

সুমন্ত্র বলতে থাকে. উঃ এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে দম ছুটে গেল আমার। আর হতভাগা ড্যাবডেবে চোখ মেলে তোমাকেই দেখছে। পলক পড়ছে না একবারও।

কথার ভঙ্গিতে এবার হাসি পায় দেবযানীর। লজ্জা পেয়ে বলে, যাঃ!

আবার খোলা গলায় হা-হা-হাসি সুমন্ত্রর। সকালের হাওয়ায় সমস্ত বাগানেই যেন ছড়িয়ে গমগম করে হাসিটা।

আনন্দে উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল পলও যেন আঁচ করে ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে ওঠে ছেলেমানুষের মতো। নাচতে নাচতে ঘুরপাক খায় দুজনকে ঘিরে।

একটু একটু করে সেও বুঝে ফেলছিল সুমন্ত্রর মেজাজটা।

না, এখন আর সেই উচ্ছ্বাস একটুও নেই পলের। সারাদিন কী মনমরা আর চুপচাপ। কাছে গেলে শুধু মুখ তুলে তাকায়। কুঁই কুঁই করা একটা চাপা শব্দ। চোখ দুটো যেন অন্য রকম। দেবযানী আলতো হাতে মাথাটা চাপড়ে দেয়। পল নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। হয়তো কিছু বলতে চায়, পারে না।

রাত্তির হলেই শুধু মাঝে মাঝে এমন চিৎকার করে পল। সেই

পুরনো দিনের মতো গম্ভীর গলায়। এখন যেমন ডাকল।

নড়াচড়া কিছু দেখলেই জানান দেয়, সে হুঁশিয়ার আছে। এ বাড়ির কোথাও কিছু ঘটলেই সে টের পায়। মনে মনে বুঝেও নেয় অনেক কিছু।

কে জানে, এখন সে কী দেখে ডেকে উঠল হঠাৎ! অথবা ভুলও হতে পারে। এমন মন ভোলানো মায়াবী জ্যোৎস্নায় কার না ভুল হয়! খুবই স্বাভাবিক।

খানিকক্ষণ ডেকেই আবার চুপচাপ হয়ে গেল। আগের চেয়েও যেন নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু একটানা ঝিঁঝির ডাক। হঠাৎ তাও বন্ধ হয়ে গেল। একেবারে নিঃসাড়, চুপচাপ।

এখন কত রাত কে জানে। দক্ষিণের জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকাল দেবযানী। ফুটফুটে জ্যোৎস্না ভরা আকাশ। শিরশির করে ইউক্যালিপটাস গাছটা দুলছে। তার ছায়া পড়ছে শার্সিতে, ঘরের দেওয়ালে। ছমছম করে যেন বুকের ভিতর···

সুমন্ত্রর সঙ্গে দেখা হওয়ার সেই প্রথম দিনটা মনে পড়ে। ওহ্! কী প্রচণ্ড জোরে, প্রায় ঝড়ের বেগে গর্জন করতে করতে ছুটে আসছিল মোটর বাইকটা। চোখে গগল্‌স, নীল জ্যাকেট পরা চওড়া কাঁধের এক যুবক আরোহী। উল্টো দিক থেকে একটা প্রাইভেট বাস, এদিকে কুকুরের দল···হঠাৎ তীব্র শব্দে ব্রেক চাপে বাইকটা, প্রায় আর্তনাদের মতো, কুকুরগুলোর চিৎকার, সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা ঘষটে গিয়ে ছিটকে পড়ল মোটর সাইকেলটা···একেবারে তাদের বাংলোর সামনেই।

বাবা ঠিক তখনই বেড়িয়ে ফিরছেন কুকুরের দলটা নিয়ে। কর্নেলের নিজের ভাষায়, এ ফ্লিট অব মাই পেটস্। ভীষণ ভালবাসেন যাদের। পরপর দুটো অ্যালসেশিয়ান, ডালমেশিয়ান, ডোবারম্যান আর সবার পিছনে তাদের আদরের ছোট্ট টিবেটিয়ান পিগি। আর একটু হলেই যে গিয়েছিল। পিগিকে বাঁচাতে গিয়েই ওল্টাল গাড়িটা। বাঁচার কথা নয়, একেবারে চাকার সামনে পড়ে গেছে ক্ষুদেটা, কর্নেল চিৎকার করে উঠেছেন···

কিন্তু শেষ মুহূর্তে দারুণ ভাবে, প্রায় অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সামলে নিল যুবক। খুব বেঁচে গেল পিগি। তবু ভীষণ চেঁচায় ভয় পেয়ে। একটু হয়তো ঘষটানি লেগেছে। প্রাণভয়ে বারবার পিছন ফিরে দেখছে লোকটাকে। আর চ্যাঁচাচ্ছে ঝুপসি লোম ঢাকা মুখটা তুলে।

কর্নেল হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন। কিছু বোঝার আগেই যেন মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল সব। এখন দেখছেন কটমট করে সেই যুবকের দিকে। মুখটা বেশ গম্ভীর।

মাটি থেকে বাইকটা তুলে সে উঠে দাঁড়াচ্ছে ধীরে ধীরে। কনুইয়ের কাছে রক্তের আভা। বেশ খানিকটা ছড়ে গেছে। গায়ে মাথায় ধুলো ময়লা। কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। মাথা উঁচু করেই উঠে দাঁড়াল সে। সপ্রতিভ, সুদর্শন, বলিষ্ঠ এক তরুণ। শেষ মুহূর্তে নিজে জখম হয়েও যে দারুণ ভাবে বাঁচিয়েছে পিগিকে। দেবযানী এক দৃষ্টিতে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে তাকে।

অন্য সময় হলে হয়তো কর্নেলও তারিফ করতেন খুব। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, ওয়েল, ওয়েল ডান মাই বয়।

কিন্তু এখন মুডটা অন্যরকম। আচমকা বাড়ির সামনেই এমন একটা ঘটনা, বেড়িয়ে ফেরার মুখে। তাছাড়া পিগির ওপর বরাবরের দুর্বলতা। তার এমন ভয় পাওয়া চিৎকার চ্যাঁচামেচি! কী সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল আর একটু হলেই—সব কিছু ভেবে কুঁচকে উঠেছে কপালটা। কিছু যেন বলতে পারছেন না আর।

দেবযানীই তখন চটপট এগিয়ে যায় সামনে, আমি দেবযানী। আসুন, আমাদের বাড়ির ভেতরে আসুন—

—আমি সুমন্ত্র। না না, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

—ঠিক আছে, কী বলছেন! অন্তত একটু ফার্স্ট এইড নিন। কোনোও অসুবিধে হবে না। কী ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলছিলেন বলুন তো? লাগেনি তো খুব?

—না না, এমন কিছু লাগেনি। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

—আগে আসুন, আপনি ভেতরে আসুন।

গেট খুলে তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায় দেবযানী।

দেখা গেল কনুইয়ের আঘাতটা তেমন কিছু নয়। তার চেয়ে বেশি ছড়ে গেছে হাতের ওপরের দিকেই।

কর্নেল নিজেই উদ্যোগী এবার ফার্স্ট এইড বক্সটা নিয়ে। জোর করে যুবকের জ্যাকেটটা খোলালেন। চটপট অ্যান্টি সেপ্‌টিক লাগিয়ে দিলেন ক্ষতের ওপর। মিস্ট্ স্প্রে করে পুরোটা ঢেকে দিলেন ওষুধ দিয়ে। ব্র্যাণ্ডি আনতে হুকুম দিলেন সুখলালকে। যুবকের তাতে অনিচ্ছা দেখে অগত্যা চায়ের ব্যবস্থা করতে বললেন। দেবযানী শুধু চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে দেখে আড়ষ্ট সুমন্ত্রকে।

তারপর আস্তে আস্তে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল। সবাই মিলে একসঙ্গে চা খাওয়া হল লনে বসে। কর্নেল পাইপ ধরিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন।

—য়ু আর সুমন্ত্র। সুমন্ত্র হোয়াট— ?

—আজ্ঞে, সুমন্ত্র সেন।

—আই সি। আয়াম কর্নেল বোস। হোয়াট য়ু আর—আই মিন সারভিস।

—এঞ্জিনিয়ার।

—অফিস থেকে ফিরছিলেন ? দেবযানী হঠাৎ বলল।

—না না, আমার ফার্ম থেকে।

—ফার্ম ? য়ু মিন ফার্মিং হাউস ? কর্নেল যেন লাফিয়ে উঠলেন কথাটা শুনে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওইরকমই একটা করেছি কিছুদিন হল।

—কিছুদিন মানে ?

—আজ্ঞে এই বছর তিনেক হল।

—মানে—চাষবাস, পোলট্রি, ফিশিং, পিগারি, সব কিছুই আছে নাকি ?

—না না, অতটা বড় ব্যাপার নয়। তবে ইচ্ছে আছে আরও অনেক কিছু করবার।

—ভেরি গুড, ইয়াং ম্যান। কোথায় লোকেশানটা এখানে ঠিক ?

—আপনাদের এখানে নয়। আরও মাইল কুড়ি যেতে হবে এখান থেকে। গঙ্গার ধারেই, বেশ নির্জন এলাকা এখনও।

—আই সি! দিস ওয়জ ওয়ান অব মাই ফেবারিট হবিস, য়ূ নো। ডু য়ূ রিয়েলি লাইক দিস? নাকি, জাস্ট এ কমারশিয়াল প্রোপোজিশান, অর এ পাস্ট টাইম— ?

—নো, নো স্যার, প্রবল ভাবে মাথা নাড়ে সুমন্ত্র, নট অ্যাট অল! আমিও শখে পড়ে এসেছি এ পথে। অ্যান্ড দিস ইজ মাই ওনলি হবি নাও। দিনে দিনে যেটা বাড়ছে আরও। অফিসে বসেও মাঝে মাঝে ভাবতে হয় এখন এর কথা।

—ইণ্টারেস্টিং! অফিসে কাজ করেও এমন শখটা বজায় রেখেছ! আই লাইক য়ূ ইয়াং ম্যান। রোজই অ্যাটেন্ড করতে হয় তো এদিকে?

—না স্যার, রোজ হয়ে ওঠে না। তবু সপ্তাহে চারদিন বা পাঁচদিন চলে আসি। এখনও অনেক কিছু করা বাকি।

—তাই বলুন। দেবযানী বলে উঠল হঠাৎ, সেই জন্যেই যেন মনে হচ্ছে আপনাকে আগে দেখেছি এই পথে।

—আপনাদের বাড়ির সামনে দিয়েই তো যাতায়াত করি। কিন্তু আজ কী রকম ভেতরে ঢুকে পড়েছি। সুমন্ত্র হাসে সামান্য দেবযানীর দিকে তাকিয়ে।

চায়ের সঙ্গে হালকা কিছু খাবার চলছিল এতক্ষণ। সুখলাল এবার গরম গরম এক প্লেট চিজ পকোড়া নিয়ে হাজির করে। সুমন্ত্র গল্প করতে বেশ আগ্রহ নিয়েই খায়। মনে হচ্ছিল যেন খুবই ক্ষুধার্ত সে। দেবযানী নিঃশব্দে ইঙ্গিত করে সুখলালকে। আরও ভাজা আসে এক প্লেট। মাছের প্রিপ্যারেশান। তারপর আরও এক প্রস্ত চায়ের প্রস্তাব।

এবারে অনুরোধটা দেবযানীর।

সুমন্ত্র মাথা নাড়ে, নো, থ্যাঙ্ক য়ূ ভেরি মাচ। আমি উঠব এখন—

কর্নেল টেবিল চাপড়ে বলে ওঠেন, কাম অন ইয়াং ম্যান, আয়াম এনজায়িং ইয়োর কম্প্যানি। আর য়ূ ইন এ হারি?

—নো স্যার, এমন কিছু তাড়া নেই। তবু—

হাবভাবে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, কর্নেল ক্রমশ মুগ্ধ হচ্ছেন

যুবকটির পরিচয় পেয়ে। তার কথাবার্তা বিনীত ভদ্র ব্যবহার, স্বপ্নভরা বড় বড় দুটো চোখ—সব কিছুর মধ্যেই যেন অন্যরকম একটা আকর্ষণ।

সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন ফার্মিং-এর কথাটা শুনে। যেটা তাঁর নিজের জীবনের স্বপ্ন ছিল একসময়। ভেবেছিলেন রিটায়ারের পর সব দিক গুছিয়ে নিয়ে নেমে পড়বেন পুরোপুরি। কিন্তু তাও হল না শেষ পর্যন্ত। অনেক কিছু ভেবেছিলেন মনে মনে, অনেক প্ল্যান প্রজেক্ট!

বেশ লাগে এখনও সেই পুরনো কথাগুলো ভাবতে। নিজের অপূর্ণ স্বপ্নের কথাটা শোনাতে একজন উৎসাহী শ্রোতার কাছে।

সেই একদিনেই যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল সুমন্ত্র তাদের সবার সঙ্গে। প্রায় আটটা পর্যন্ত কাটিয়ে আবার আসব বলে শেষে বিদায় নিয়ে গেল।

কর্নেল নিজেই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে হাত নাড়লেন, বি ভেরি কেয়ারফুল মাই বয়। অ্যান্ড নো টেনশন ফর দিস—।

—থ্যাংক য়্যু স্যার। কিছু ভাববেন না আপনারা। ঠিক চলে যাব আমি—গুড নাইট স্যার!

দেবযানীর দিকেও হাত নাড়ে সে হাসি মুখে। তারপরই গর্জন করে ওঠে বাইকটা। অনেকক্ষণ ধরে কানে আসে তার ছুটে যাওয়ার আওয়াজ। গট্‌…গট্‌ গট্‌…

২

রাত পাখি ডেকে উঠল একটা কোথায়। ভয় পাওয়া গলার স্বর। তারপরই আবার চুপচাপ। কী দেখে ভয় পেল কে জানে। মাঠের দিক থেকে সেই সোঁ সোঁ হাওয়ার শব্দ আবার। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো…

জ্যোৎস্নার মধ্যে দুলতে থাকা দেয়ালের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়ে আরও এগিয়ে আসছে। মাথার কাছাকাছি এসে দুলছে এখন। অলৌকিক এক ছবির মতো পাতায় পাতায় ঝিলি কাটছে জ্যোৎস্না

রাতের হাওয়া···ছবিটা ঢেকেই ফেলছে তাকে···

দেবযানীর আবার মনে পড়তে থাকে সুমন্ত্রকে। বলিষ্ঠ, সুদর্শন সেই যুবকের মুখ।

মাত্র কয়েকটা দিন। তার মধ্যেই কী অদ্ভুতভাবে কাছাকাছি এসে গেল দুজনে। যেন কোনও দৈবের অদৃশ্য ইশারায়।

সেদিন বিকেলে বাবা বাড়ি নেই। ব্রিজলাল ঘোড়াটাকে নিয়ে দলাইমলাই করছে লনের মধ্যে। সুখলাল কিচেন গার্ডেনে। নতুন মুরগির ঘর তৈরি নিয়ে ব্যস্ত। তার ঠুক ঠাক শব্দ আসছে ক্রমাগত। বাগানে শালিকগুলোর কী নিয়ে তুমুল চিৎকার চ্যাঁচামেচি···

তখনই হঠাৎ সুমন্ত্র এসে হাজির।

বাইকটা থামিয়ে হাসল তার দিকে তাকিয়ে। তারপর কাছে এসে বলল, ভাল ?

—হ্যাঁ খুব ভাল। দেবযানী মাথা হেলায়। বুকের ভেতর তখনও ঝমঝম করে কাঁপছে যেন বাইকের শব্দটা।

—একি ! কর্নেল কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি ?

—বাবা ? বাবা তো বাড়ি নেই। ফোর্ট উইলিয়ামে গেছেন দরকারি কাজে। সেখান থেকে কম্যান্ড হসপিটালেও যাবেন, এক বন্ধুকে দেখতে।

—ও আচ্ছা। তাহলে হঠাৎ এই ঘোড়া বেরিয়েছে যে ?

—এমনিই। ব্রিজলাল ঘুরে এল এক চক্কর। এখন চাঙ্গা করে দিচ্ছে ম্যাসাজ দিয়ে।

—ঘোড়াটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। দারুণ গর্জাস ! তুমি জান হর্স রাইডিং ?

—নাহ্। দেবযানী মৃদু হাসল লজ্জা পেয়ে, শেখা হয়নি। বাবা অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন কয়েকদিন।

—তারপর ?

—তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, হোপলেস্। আমিও বেঁচে গেলাম।

বলতে বলতে খুব হাসে দেবযানী।

সুমন্ত্রর মুখেও হাসি। বলল, শিখলে ভালই করতে কিন্তু।

অ্যাজ এ হবি ইটস্ ওয়ান্ডারফুল। অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চারাস টু!

—তুমি জান রাইডিং?

—না। চান্স পাইনি শেখার।

—বেশ তো, আমি বাবাকে বলব। এখন শিখে নাও।

—নো, থ্যাঙ্ক য়ু ম্যাডাম। আর হল না। সারাদিন এখন এই বাইক ছুটিয়েই সব শখ মেটাতে হচ্ছে। আর ফুরসৎ নেই।

কিচেন থেকে সুশীলাদি বেরিয়ে এসেছে। জানতে চায়, চা, খাবার কী আনবে এখন। সুমন্ত্র বাধা দিল।

বলল, না না, কিছুই নয় এখন।

—কেন, খাবে না কেন?

—এখন নয়। চলো আজ কোথাও একটু বেরোই।

—কোথায় বেরুবে?

—কেন, তোমাদের এখানে কোনও বেড়ানোর জায়গা নেই?

কী বলবে দেবযানী! কোথা থেকে একটা লাজুক আড়ষ্টতা এসে কথা আটকে দেয় যেন। তাকে নিয়ে বাইরে বেরোবার প্রস্তাব সেই প্রথম সুমন্ত্রর!

সে সরাসরি তাকিয়েই থাকে প্রশ্নটা চোখে নিয়ে, কি?

—হ্যাঁ, আছেই তো। দেবযানী মাথা হেলায়, এই তো এখানে কুঠিঘাটে, গঙ্গার ধারে। সুন্দর বেড়ানোর জায়গা একটা।

—বাহ্ ফাইন! তাহলে চলো সেখানেই ঘুরে আসা যাক একটু। যাবে তো?

দেবযানী আচ্ছন্নের মতো মাথা হেলায়, হুঁ।

ইচ্ছে অনিচ্ছের বাইরে সব এখন। এক অচেনা আবেগ তাকে প্রবল ভাবে টানছে কোথাও।

—এখান থেকে কতদূর সেই ঘাটটা? সুমন্ত্র উঠে দাঁড়িয়েছে।

—অ-নে-ক দূর! রহস্য করে হাসল দেবযানী, যেতে যেতে হাঁপিয়েও পড়তে পার।

—তার মানে?

—হেঁটে গেলে কুড়ি মিনিট; গাড়িতে পাঁচ কি, চার।

—মাত্র! তাহলে বাইকেই যাই। পিছনে বসতে আপত্তি

নেই তো ?

দেবযানী নিঃশব্দে হাসল। বুকের মধ্যে তিরতির করা এক কাঁপুনি। তবু বাধ্য মেয়ের মতোই সেই প্রবল পুরুষটির পিছনে উঠে বসল।

পরক্ষণেই গর্জন করে দুরন্ত বেগে ছুটে চলে গাড়িটা। আর দেখতে দেখতেই নিমেষের মধ্যে কুঠিঘাট।

অদ্ভুত সেই স্বপ্নের মতো বিকেলটা। নরম আলোয় ভরে ওঠা এক উদাসীন নদী। তরতর করে বয়ে চলেছে সমানে। ওপারের ঝাপসা গাছপালা, নিস্তব্ধ ঘরবাড়ি—এপারে মানুষের ভিড়, হৈ হট্টগোল, কোনওদিকেই যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

কিন্তু কোথাও মনের মতো একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজে পায় না সুমন্ত্র। অবশেষে খেয়াঘাটের পাশে একটা ফাঁকা চায়ের দোকান দেখে সেখানেই ঢুকল। একেবারে গঙ্গার পাড়েই চালাঘরের দোকান।

লোকটা খুবই উৎসাহিত হয় তাদের দেখে। নিজের গামছা দিয়েই পরিষ্কার করে দিল বসার বেঞ্চিটা। তারপর খুব যত্ন নিয়ে চা বানায় তাদের। নতুন চা পাতা ঢেলে ভর্তি ভর্তি দুভাঁড় ঘন দুধের চা।

—আসুন হুজুর। বাঁ হাতটা কনুইতে ঠেকিয়ে এগিয়ে দিল পরপর।

সুমন্ত্র এক দৃষ্টিতে নদী দেখে। কুল কুল করে পাড়ে এসে ঢেউ ভাঙছে গঙ্গার। দূরে একটা পাল তোলা নৌকো ভেসে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, বোটিং করবে একটু ? নৌকোয় চেপে এখন গঙ্গায় ঘুরতে দারুণ লাগবে।

—ঠিক বলেছেন, হুজুর। এখন গঙ্গার হাওয়া খেতে খুব ভাল লাগে। অনেকেই খায়।

লোকটাই উৎসাহ নিয়ে একজন মাঝিও ঠিক করে দিল।

—এই যে বাবু, এই দুগ্গা মাঝির সঙ্গে যান। খুব পুরনো লোক ঘাটের। আপনাদের ভাল করে ঘুরিয়ে দেবে।

মাঝি তার ছোট্ট নৌকোটা এনে ঘাটে দাঁড় করাল। বেশ

পরিচ্ছন্ন ছিমছাম চেহারা। ওপরে বাঁশের পাটাতন। বসবার জন্যে একটা মাদুরও গোটানো একদিকে। গলুইয়ের দিকে ছোট্ট ছইতোলা এক ফালি। বৃষ্টি বাদলার জন্যে মাথা বাঁচানোর ব্যবস্থা।

সুমন্ত্রর হাত ধরেই আস্তে করে পা রাখল দেবযানী। তবু টলমল করে দোলে নৌকো। শরীরটা কাঁপে। তার হাত ধরেই অবশেষে সামলায় নিজেকে। পাশে বসে পড়ে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলে দূরের দিকে।

চারদিকে তখন শেষ বিকেলের লাল আলো। নীল আকাশে একদল পাখি উড়ে যাচ্ছে। অনেকদূর পর্যন্ত তাদের দেখা যায়। পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। সেই আসন্ন সূর্যাস্তের রঙের মধ্যে ঝিলমিল করতে করতে ওরা এক সময় মিলিয়ে যায়। তাদের নৌকোটাও চলে সেই দিক মুখ করে।

হঠাৎ মন কেমন করে যেন এই মুহূর্তে। দেবযানী একটা কিছু বলবে বলবে করেও বলতে পারছে না। কী বলবে সে? চারদিকে এক বিশাল শূন্য যেন চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে। একটা চাপা সুর ভেসে আসছে গানের। সঙ্গে বাজনা। খোল করতাল, খঞ্জনী, বাঁশি। সমবেত কণ্ঠে কোথাও যেন ভজন গান হচ্ছে। হাওয়ার মধ্যে তার রেশ। কখনও স্পষ্ট কখনও আবার অস্পষ্ট···

নিজের অজ্ঞান্তেই কখন সুর বেরিয়ে আসে গুনগুন করে···এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়···এই আকাশে···

কথা নয়, শুধু সুরের গুঞ্জন গানটার।

—এই, তুমি গান জান? সুমন্ত্র হঠাৎ ফিরে তাকাল।

—না না, এমন কিছু নয়। দেবযানী লজ্জা পেয়ে যায়।

—এই যে গাইলে?

—কোথায় গাইলাম! ওটা কি গান হল?

—শোনাও একটু ভাল করে, তবে। তুমি নিশ্চয়ই গান জান। আমার মন বলছে, জান। এই পরিবেশে তোমার একটা গান না হলে জমে?

—না প্লিজ, এখন নয়। অন্য একদিন শোনাব। ঠিক শোনাব।

—এখনই বা আপত্তিটা কীসের? শ্রোতা বলতে তো আমরা দুজন। আমি আর মাঝি। আর নদীর ওপর এমন সুন্দর একটা

বিকেল…

—না গো, এখন নয়। অন্য একদিন। কথা দিচ্ছি আমি।

—বেশ। সুমন্ত্র হাসল এক আবেশভরা দৃষ্টিতে।

হাওয়ায় ঝলকে দাপিয়ে উঠছে তার ঝাঁকড়া চুলগুলো। ফর্সা মুখটা লাল রোদ্দুরের রঙে। সেই ভাবেই তাকিয়ে থাকে চুপচাপ।

দেখতে দেখতে আরও অনেক দূর চলে এসেছে ওরা। সেই ভজনের সুর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এবার। দলটাকে দেখাও যাচ্ছে সামনে।

অনেকগুলো নৌকো এক সঙ্গে। চারদিক থেকে ঘিরে আছে যেন কিছু একটা। আর সমানে বাজনা বাজিয়ে সমবেত কণ্ঠে ভজন গান চলছে। তুলসী দাসের ভজন। কী একটা ধর্মীয় উৎসব চলছে যেন গঙ্গার ওপর। সূর্যাস্তের মুহূর্তে থমথমে আকাশে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে তার প্রতিধ্বনি।

দেবযানী আর সুমন্ত্র দুজনেই অবাক হয়ে তাকায় ব্যাপারটা দেখে। গান গাইতে গাইতে কেমন ভাব বিহ্বল হয়ে পড়ছে লোকগুলো। করুণ বিলাপধ্বনিও উঠছে এক একবার।

—মাঝি ভাই, কী হচ্ছে বল তো, ওখানে? দেবযানী হঠাৎ বলে ওঠে।

—দুখিয়াবাবার জলসমাধি হচ্ছে মা, আজ।

—জলসমাধি সেটা আবার কী রকম? সুমন্ত্র বলল।

মাঝি বুঝিয়ে বলে, এই-ই নিয়ম বাবু। বড় বড় সাধুবাবাদের বেলায় হয়। মৃত্যুর পর দাহ করার বদলে এমনি গান বাজনা করে ভক্তরা গুরুকে জলে ডুবিয়ে দেয়। একে বলে ঠাকুরের জলসমাধি। এখন সেই উৎসব হচ্ছে। সূর্যটা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে দুখিয়াবাবাকেও বিদায় দেবে ওরা…

শুনতে শুনতে দেবযানীর হাত দুটো জড়ো হয়ে আপনা থেকেই কপালে ওঠে আসে। এমনি করে একজন সাধক চলে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে! তাদের চোখের সামনে!

সমন্ত্র বলতে থাকে, সে কি মাঝি! কেউ আপত্তি করে না এ নিয়ে।

—কেন বাবু, আপত্তি করবে কেন ?

—এভাবে জলে মৃতদেহ ফেললে, জল দূষিত হয়ে যায় না ? এর চেয়ে দাহ করার নিয়মই তো ভাল।

—হুজুর, এ সব হল মহাপুরুষদের ব্যাপার। আমরা এর কতটুকু জানি। দুখিয়াবাবার নাম শুনলে সবাই মাথা নোয়ায় এ অঞ্চলে। একেবারে সাক্ষাৎ ভগমানের অবতার। তার জন্যি কি কখনও নদীর জল খারাপ হয় ?

বলতে বলতে মাঝি কপালে হাত দুটো ঠেকায়। বিড়বিড় করে কী প্রার্থনা করে তার ইষ্টদেবতার কাছে। হয়তো শেষ প্রণাম জানায় দুখিয়াবাবাকেও।

দেবযানী বলল, মাঝি ভাই, আমরা একটু দেখব ওঁকে। আরও একটু কাছে নিয়ে চলো আমাদের—

সুমন্ত্রও বলে, হ্যাঁ কর্তা, তাই চলো। একটু কাছে থেকে দেখা যাক ঘটনাটা।

—না মা, কাছে যাওয়া যাবে না আর। মানা আছে। দেখছেন না, গুরুভাইদের দল সব ঘিরে রেখেছে বাবাকে। অন্য কোনও লোকের ওখানে যাওয়ার হুকুম নেই।

—ঠিক আছে ভাই। তুমি তাহলে একটু কাছাকাছিই থাক, যাতে আমরা দেখতে পারি।

—হ্যাঁ মা, সেই ভাল। এখান থেকেই দেখেন আপনারা। এখানেই ঘুরছি—

লাল সূর্যটা নেমে এসেছে আকাশের সীমানায়। আর একটু-ক্ষণের মধ্যে ডুবে যাবে গাছপালার আড়ালে, জলের নিচে। চারদিকে ছড়ানো তার মোহময় ইন্দ্রজাল !

তার মধ্যেই এবার স্পষ্ট দেখা যায়। পাশাপাশি দুটো নৌকো জোড়া দেওয়া। ওপরে পাতা চওড়া পাটাতনের শয্যায় শায়িত বাবার দেহ। ডাঁই হয়ে থাকা ফুল মালার স্তূপ। ধূপের ধোঁয়া। আগরু, চন্দনের গন্ধ হাওয়ায়। সঙ্গে ভক্ত শিষ্যদের গান। বিলাপধ্বনি ! চারপাশে ছোট ছোট নৌকোয় ঘিরে তারা পাহারা দিয়ে চলেছে বাবাকে। আর অবিরাম ভক্তিসঙ্গীতের সুরে ভরিয়ে
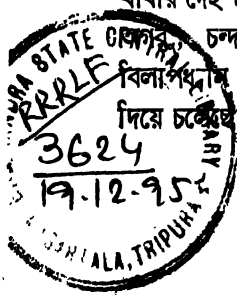
দিচ্ছে আকাশ বাতাস।

সূর্যটা নিস্তেজ হয়ে আসছে যেন এবার। ওপারের ঝাপসা গাছপালাগুলো তেমনি স্থির, চুপচাপ। এক ব্যাপ্ত বিষণ্ণ ছবি চরাচর জুড়ে। মনটা আপনা থেকেই ভারি হয়ে আসে দেবযানীর। হুঙ্কার দিয়ে উঠল ওরা হঠাৎ একসঙ্গে। বাবার নামে জয়ধ্বনি....

সূর্যাস্ত হয়ে গেল। আকাশের লাল আলোর ঢল জলের মধ্যে দুলছে এখন। তার মধ্যেই দুখিয়াবাবাকে ধীরে ধীরে সমাধিস্থ করা হল। বারবার জয়ধ্বনি উঠল বাবার নামে। শিষ্যরা আকাশে হাত তুলে নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। তীব্র সঙ্গীতের ধ্বনি···বুক ফাটা এক হাহাকার যেন ছড়িয়ে পড়ছে গোধূলি বেলার গঙ্গাবক্ষে···

দুহাত জড়ো করে দেবযানী প্রণাম করে আকাশের দিকে। দুখিয়াবাবার মুখটা কল্পনা করতে চেষ্টা করে একবার। মন খারাপ লাগে কেমন।

সুমন্ত্রও হতবাক। সূর্যাস্ত দেখার বদলে এই অভিনব দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে সব হিসেবটাই গোলমাল হয়ে গেল আজ।

ফেরার পথে খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে হঠাৎ আফসোস করে বলল, ইস! কী ভুল হয়ে গেছে! একটা ক্যামেরা সঙ্গে থাকলে ছবি তোলা যেত ঘটনাটার, লোককে দেখানো যেত। খুব মিস্ করলাম আজ— ।

—ভালই হয়েছে, দেবযানী মাথা নাড়ল। ওরা নিশ্চয়ই বাধা দিত তোমাকে ছবি তুলতে।

—কেন, ছবি তোলায় বাধা দেবে কেন ?

—আপত্তি আছে নিশ্চয় কোনও। সেই জন্যেই তো গুরুকে এমন ঘিরে রেখেছিল ওরা। কাউকে কাছে যেতে দেয়নি—

—বুঝলাম। কিন্তু তুমিও কি আপত্তি করতে ?

—মানে ?

—মানে, যদি তোমার ছবিই তুলতাম। সূর্যাস্তের মুখোমুখি এমন শান্ত সুন্দর হয়ে বসে আছ। চোখে মুখে এক অদ্ভুত আবেগ।

বলতে বলতে সুমন্ত্র হাসে রহস্য করে।

দেবযানীও হাসল মাথা নেড়ে তার দিকে তাকিয়ে।

— চট করে এমন একটা দৃশ্য আবার কে জানে, কবে পাব! সুমন্ত্র বলল।

ইঙ্গিতটা বুঝেও দেবযানী কিছু বলে না। বলতে ইচ্ছে করছিল না এই মুহূর্তে। মনটা যেন অকারণে ভার হয়ে আসে তার। বার বার মনে পড়ছিল সেই দৃশ্য। এমন সুন্দর একটি দিনে, তাদের বাইরে বেড়ানো প্রথম বিকেলের মনোরম সৌন্দর্যের মধ্যে, কোথাও যেন বিঁধছিল সেই মৃত্যুর স্মৃতিটা। এখনও কানের মধ্যে ভাসে সেই গান, বিলাপধ্বনি···হাহাকার···।

—আমি কিন্তু তোমার এই সব বাবাদের, অলৌকিক ব্যাপার-ট্যাপারে তেমন বিশ্বাস করতে পারি না। সুমন্ত্র হঠাৎ বলে উঠল।

—অনেকেই করে না। দেবযানী বলল আস্তে আস্তে।

—কেনই বা করবে? সবাই জানে এদের বেশির ভাগই হল বুজরুকি। বাকিটা প্রচার।

—তা হবে। দেবযানী আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করে।

—তুমি বিশ্বাস করো? এইসব—

—কী জানি। কখনও ভেবে দেখিনি। তবু মনে হয় কোথায় একটা কিছু আছে, হয়তো আমরা জানি না।

—যা জানি না, তা নিয়ে মাথা না ঘামালেই হল?

—আমি তো মাথা ঘামাচ্ছি না।

—তাহলে এমন চুপচাপ করে আছ কেন?

—তাও জানি না। হেসে ফেলল সে।

—আমি জানি। সুমন্ত্রর চোখে রহস্য।

—জান! কেন বল তো?

—কারণ, বন্ধু হিসেবে আমি একেবারেই অযোগ্য।

—যাঃ কী বলছ! ছি ছি—।

—যা সত্যি তাই বলছি। আমিই পারিনি তোমাকে কথা বলাতে। সঙ্কোচটা কাটিয়ে দিতে, ঠিক আছে, আর হবে না।

—তার মানে?

—পরের বার এমন অন্যায়টা আর হবে না, ম্যাডাম।

হঠাৎ চমক লাগে যেন কথাটা শুনে। গলার স্বর ভারি সুমন্ত্রর।

দেবযানী হেসে ফেলল। কুলকুল করা জলের শব্দের মতো হাসতে হাসতে বলল, তুমি না, একটা ভারি অদ্ভুত···।

—অদ্ভুত কি?

—ছেলে!

আবার জলের শব্দ ওঠে। নৌকো ঘাটে ফিরে এসেছে তখন। আকাশে তারা ফুটছে এক এক করে। পাড়ের বাঁধানো রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো।

৩

আবার সেই মোটর বাইকের শব্দ গাঁক গাঁক করে ··ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে তারা···

কথা রেখেছিল সুমন্ত্র। দ্বিতীয় দিনে এক লাফে একেবারে অনেক দূরের পথ। গঙ্গার পাড়ে সেই তার খামার বাড়িতেই নিয়ে চলল এবার বেড়াতে। কর্নেলকে বলে তার সম্মতি নিয়েই গেল।

ততদিনে আরও কাছাকাছি এসে গেছে দুজনে।

রোদ ঝলমলে এক সুন্দর ছুটির দিন। রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা। তার মধ্যে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে সে। পিছনে দেবযানী। ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় উথাল পাতাল, এলোমেলো। পথ ফাঁকা পেয়ে বেগটা আরও বেশি বাড়ায় সুমন্ত্র। ছেলেমানুষের মতো স্বভাব যেন। দেবযানী বাধা দিতে গিয়েও পারে না। জোর করে চেপে থাকে হাতে ধরা হ্যাণ্ডেলটা। কখনও ঝপাং করে সুমন্ত্রকেই দুহাতে জড়িয়ে ধরে।

সে হাসে হা-হা করে। বলে, দেবী ভয় করছে না তো। আর য়ু অল রাইট। এই তো এসে গেলাম প্রায়—

—আমি ঠিক আছি। প্লিজ তুমি দেখে চালাও—

আবার হা-হা হাসির শব্দ। হাওয়ার মধ্যেই যেন ওলট পালট খেয়ে ছড়িয়ে যায় চারপাশে।

মাঝে মাঝে টাল খেয়ে একদম বেঁকে যাচ্ছে সে। আবার সোজা। একটা গাড়িকেও আগে যেতে দেবে না। অদ্ভুত ছটফটে ভঙ্গিতে পর পর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে সব। বাস, লরি, প্রাইভেট গাড়ি···। লাফিয়ে উঠছে স্পিড ব্রেকারের ধাক্কায়। হা-হা হাসির শব্দ। মজা, আজ সব কিছুতেই যেন মজা তার!

দেবযানীর বুকের মধ্যে ঝমঝম করে। প্রাণপনে মুখটা চেপে আছে তার চওড়া পিঠের ওপর।···

হঠাৎ একসময় কানে গেল, দেবী, এই···

—কী, বলো? মুখ তুলল সে।

—তাকিয়ে দেখ, বাঁ দিকে। ওই যে বড় বড় গাছগুলো, ওখান থেকেই শুরু আমাদের বাগান। সোজা চলে গিয়ে একেবারে গঙ্গার ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। দেখতে পাচ্ছ···

কথাগুলো ভেঙে যাচ্ছে হাওয়ার তোড়ে। এক অন্যরকম শব্দের গুঞ্জন। তীব্র ইলেকট্রিক হর্ন ওধার থেকে ছুটে আসা এক ম্যাটাডোর ভ্যানের। কঁক্ কঁক্ করে মোরগের পাল ছুটছে ভয় পেয়ে।

তার মধ্যেও সে মুখ তুলে তাকায়। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতে থাকে সেই দিকে। গাছগাছালি ভরা সবুজ প্রান্তর। অজস্র লতাপাতার বুনো ঝোপ। সারি সারি লাল কুসুম পাতার বাহার। ধু-ধু নীল আকাশ···আশ্চর্য এক ছবির মতো সব মিলেমিশে একাকার তার চোখের সামনে।

দেবযানী কোনও কথা খুঁজে পায় না।

নাকে মুখে একটানা সুমন্ত্রর সেই পুরুষালি ঘ্রাণ। বারবার ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে এসে। এক ঝিমঝিমে অবশ করা অনুভূতি। কোনও জবাব না দিয়ে সে সহসা সুমন্ত্রর শরীরটাই আরও জোরে আঁকড়ে ধরে দু হাতে।

বাইকটা হঠাৎ বেঁকে গিয়ে তখন বাগানের মধ্যে ঢুকছে। আঁকড়ে ধরেই সে টালটা সামলায়।

আশ্চর্য! বাগানে পা দিতেই যেন আরও ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসল সুমন্ত্রকে।

কোন কথা নেই, একটা ঝাঁকড়া গাছের নিচে ঘাসের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। দেবযানীকেও টেনে বসায় পাশে।

—আগে এখানে একটু বসে নাও।

—একটু ঘুরিয়ে দেখাবে না আমায়, ফার্মটা ?

—হবে। আস্তে আস্তে সব হবে। সুমন্ত্র হাসল।

—তোমার টায়ার্ড লাগছে ?

—নাহ্! সেজন্যে নয়।

—তবে ?

—চুপচাপ তুমি এদের সঙ্গে পরিচয় করে নাও আগে। এরা এখন সবাই তোমায় দেখছে।

—সে কি! কাদের কথা বলছ!

—এই বাগানের গাছগাছালি, পাখি, পতঙ্গ, ক্ষেত, খামার, ঘাস, মাটি—সবাই। বলতে বলতে অদ্ভুত ছেলেমানুষের মতো হাসল সুমন্ত্র।

—ওহ্! সত্যি! তুমি একটা না আস্ত পাগল!

—ওদের কাছাকাছি থাকলে তুমিও তাই হবে।

—তুমি বুঝি শুনতে পাও এদের কথা ? গলাটা যেন কাঁপে দেবযানীর।

সুমন্ত্র অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ঠাট্টা করছে না। বলল, হ্যাঁ পাই। চেষ্টা করলে এবার তুমিও পাবে।

—কী বলে ওরা ?

—শুনবে ? মুখটা নামাও। এইখানে আমার বুকের ওপর একটু কান পাতো। প্লিজ দেবী—দেখ না, একবার—

হঠাৎ চমক লাগে দেবযানীর। আড়ষ্ট হয়ে চারদিকে তাকায়। ফাঁকা নির্জন বনভূমি। শন শন হাওয়া বয়ে চলেছে সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে। ওপাশে সবজি ক্ষেত। আম কাঁঠালের বাগান। থোকা থোকা রঙ্গন আর কাঠ্‌টগরের সারি। পড়ন্ত বেলার আলোয় এক আশ্চর্য মনোরম রঙ ধরে আছে। গুন গুন করে একদল মৌমাছি উড়ে আসছে কোথা থেকে···

ধীরে ধীরে মুখটা নামিয়ে কান পাতল সে সুমন্ত্রর বুকে। এখনও গরম ভাপ উঠছে আগুনের মতো। তীব্র সেই পুরুষালি

ঘ্রাণ! তার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ঢিব্ ঢাব্···ঢিব্ ঢাব্···

আলতো এক চাপড় দিয়ে বলল, যাঃ! এ তো তোমার বুকের শব্দ।

—আমার একার নয় দেবী, এর সঙ্গে আরও অনেকের, এই মাটির—এই জঙ্গলের শব্দ মিশে আছে। আর একটু চেষ্টা করো, ঠিক ধরতে পারবে।

বলতে বলতে তার মুখটা বুকের সঙ্গে লাগিয়ে আরও গভীর ভাবে চেপে ধরে সুমন্ত্র।

ছটফট করে কেঁপে ওঠে দেবযানী, এই না, না। প্লিজ সুমন—

সুমন্ত্র আর কোনও বাধাই মানে না। শক্ত হাতে তাকে জড়িয়ে নিয়ে প্রবল বেগে আদর করতে থাকে। বহুদিনের রুদ্ধ আবেগের বাঁধটা ভেঙে গেল এক মুহূর্তে। ছটফট করতে করতে দেবযানীও সাড়া দেয় অবশেষে।

অবশ করা সেই প্রথম মুহূর্তে, কানে আসে এক অচেনা পাখির ডাক। ডেকেই চলেছে জঙ্গলের মধ্যে পাখিটা কোথাও,···টি উ-টি টি উ···টি উ-টি টি উ··

—শুনতে পাচ্ছ দেবী? পাখিটা কী বলছে তোমায়?

—কী বলছে?

—বলছে ভয় কি, তোমার ভয় কি? আমরা তো আছি—

—যাঃ বাজে কথা।

—তুমি শোনো না একটু কান পেতে।

দেবযানী জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে খেয়াল করে শোনে ডাকটা। বিস্ফারিত অবাক চোখে শুনতে শুনতে হাসে।

বলল, মোটেই না। ও বলছে, ছিঃ লজ্জা নেই, লজ্জা নেই তোমাদের?

—বা, দেবী বাহ্! কে বললে, তুমি ওদের ভাষা বোঝ না। এই তো বুঝে ফেলেছ।

দেবযানী হাসে লজ্জা পেয়ে। উত্তর দেয় না।

—তবে একটু ভুল শুনেছ। এটা অরণ্য, এখানে কেউ কাউকে লজ্জা পায় না।

—তোমার মতো, না?

—আমাদের দুজনের মতোই।

বলতে বলতে হা-হা করে খোলা গলায় হাসে সুমন্ত্র। একদল উড়ন্ত ফড়িং যেন ঢেউ খেয়ে ঘুরে গেল তার দমকে। টলতে টলতে হলুদ পাতা খসে পড়ে বাদাম গাছের মাথা থেকে।

তারপর থেমে গেলে সব চুপচাপ আবার। একদল ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে থাকল সুযোগ বুঝে। একদম তাদের মাথার কাছে। নাকি পায়ের দিকেও? এক অগাধ গভীর নির্জনতা শুধু চারপাশে।

সুমন্ত্রকে যেন অন্যরকম লাগে এখন। কোনও তাড়া নেই ওঠার। একভাবে চুপচাপ বসেই থাকে।

হঠাৎ বলল, একটা গান শোনাও, দেবী। সেই গানটা, এখন আর কোনও না চলবে না।

—ক্ষেপেছ? এই জঙ্গলের মধ্যে বসে গান! অন্য আর এক সময়। এখান থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে বরং—

—না, দেবী। তুমি সেদিন কিন্তু কথা দিয়েছিলে।

—দিয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে এখানে—

—এখানেই তো গান করার আসল জায়গা। আমরা সবাই এক-সঙ্গে শুনব—

বলতে বলতে আবার ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল সে। চোখ দুটো বন্ধ। দেবযানীর হাতটা ধরে আছে তার মধ্যেও।

বলল, এখানে এরা সবাই কান পেতে আছে তোমার জন্যে। গাও দেবী, এবার শুরু করো—

বুকের মধ্যে যেন কেঁপে ওঠে দেবযানীর। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে তাকায়। আর কেউ নেই কোথাও। শুধু সেই ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল, আকাশ, মাঠ, পাখিদের ডাক। হাওয়ার শন্ শন্…

তার মধ্যেই গেয়ে উঠল সে দিনের সেই অসম্পূর্ণ গানটা:

এই আকাশ—আমার মুক্তি আলোয় আলোয়…

প্রথমে ছিল লজ্জা, তারপর সঙ্কোচ। সঙ্কোচ আর আড়ষ্টতা। কিন্তু গান শুরু করতেই এখন সব কেটে গেল। ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে উঠছে মন। সুরের মধ্যেই এবার নিজেকে উজাড় করে দিতে

চায় যেন দেবযানী। আর কেউ কোথাও নেই। শুধু সে আর সুমন্ত্র। আর সুমনের নিস্তব্ধ সবুজ খামারবাড়ি!

সেই খোলা আকাশের নীচে এক অদ্ভুত আবেগে সে গেয়ে চলে ঃ

দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে…

গান নয়, এ যেন তারই মনের কথা হয়ে ওঠে। অপরাহ্ণের আলোয় সেই নিস্তব্ধ বনভূমির কাছে। তার সুমনের কাছে।

একটা গানে তাই তৃপ্তি হয় না। মনের কথা শেষ হয় না। সুমন্ত্র একবার বলতে না বলতেই তাই আবার গেয়ে ওঠে ঃ

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।

তারপর আরও একটা। ঝর্ণার মতো গানের ধারা। চলতেই থাকে। অভিভূত আচ্ছন্ন সুমন্ত্র। মুখটা খুশিতে চকচকে উজ্জ্বল!

বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছে তখন। দুজনে ঘুরছে এলো-মেলো। শনশনে হাওয়া গঙ্গার দিক থেকে। বুনো ফুলের গন্ধ। অজস্র পাখিদের কিচিরমিচির। তার মধ্যেই দুজনে হেঁটে চলেছে একটা ঘোরের মধ্যে। কথা ফুরোচ্ছে না যেন সুমন্ত্রর।

দেবযানী একসময় বলল, না সুমন, আজ আর নয়। এবার ফিরি চলো—।

—সে কি, এর মধ্যেই! এখনও তো কিছুই দেখলি না।

—যা দেখেছি এই অনেক। খুব ভাল লাগল।

—কিন্তু ওদিকে যে আর একটা মহাল। আমাদের ফলের বাগান, পুকুর—

—আর একদিন হবে। একদিনে সব নাই বা হল। হাসল সে।

—বেশ! সুমন্ত্রও হাসল চোখের দিকে তাকিয়ে।

—অন্য আর একদিন, সকাল সকাল এসে গোটা দিনটা কাটিয়ে

যাব বরং ?

—থ্যাঙ্ক য়ু। সেই ভাল।

সুমন্ত্র কী ভাবল যেন একটু।

পরে বলল, কিন্তু অনুপমের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না, যাওয়ার আগে ? শুনলে একটু দুঃখ পাবে হয়তো।

—অ-নু-প-ম ! ও তোমার সেই ভাই, না ?

—আমার বন্ধুও বলতে পার। তোমাকে খুব জানে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু সে কোথায় এখানে ?

—আর একটু যেতে হবে। পুকুরের ওধারে গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে। –

—অনুপম কি এখানে থাকে ?

—তা প্রায় একরকম। গোটা দিনটাই পড়ে আছে এই জঙ্গলে ; কোন কোনও দিন রাতও কাটিয়ে দেয়।

—আশ্চর্য !

—আসলে সেই তো এই সব কিছুর পিছনে। হতভাগা এক নম্বরের পাগল। সব সময় একটা না একটা মতলব খেলছে মাথায়। আমাকেও পাগল করে তোলে তাই নিয়ে। আমরা আজ আসতে পারি, ওকে বলেছিলাম। তাই—

—ছি ছি, আগে তো বলনি একবারও। আমাদের যদি তখন দেখতো গিয়ে ওই জঙ্গলে ? ছি ছি···

দেবযানী লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। চোখে ভ্রূকুটি। তীক্ষ্ণ হয়ে বিদ্ধ করে সুমন্ত্রকে।

সুমন্ত্রর সেই হা-হা হাসির দমক আবার। সব কিছু যেন হেসেই উড়িয়ে দেবে সে এমনি।

—কখনই আসবে না ও এদিকে। পুকুর পাড়ের জঙ্গলে ওর নিজের হাতে গড়া বাগান আর পাখি নিয়ে আজ কদিন হল মেতে আছে। আমি জানি তো ওকে ভাল করে।

—তাহলেও।

—তাহলেও কি ?

—জানি না। দেবযানীর চোখে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ আবার।

সুমন্ত্র হাসল, তোমার নিজের চোখে ওকে দেখ একবার, তাহলে

ভুলটা ভেঙ্গে যাবে। সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ছেলে একটা। এই গাছ-গাছালি, ফুল, পাখিদের বাইরের কোনও জগতের কথা ও ভাবেই না। মাঝে মাঝে আমারই খুব অবাক লাগে। আমি পেরে উঠি না তাল রাখতে ওর সঙ্গে।

—কে ধরাল ওকে এমন নেশা?

—ধরিয়েছি আমিই বলতে পার, কিন্তু ও আমাকে ছাড়িয়ে গেছে। এখন অনেক বেশি ডিভোটেড আমার চেয়ে। ওকে ছাড়া এই ফার্মিং-এর কথা আর ভাবতেই পারি না···

পায়ে পায়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল ওরা। আমবাগানটা ছাড়িয়ে এপারে চলে এল। চমৎকার ঘাট বাঁধানো পুকুর একটা। হাস চরছে একদল এখনও। তাদের ডাক। ডানা ঝাড়ার শব্দ। একটু দাঁড়ায় দেবযানী। ছোট্ট একখানা খড়ের চালাঘর। লাউমাচা লতিয়ে উঠেছে চালাভর্তি। লাউ ফলেওছে অনেক সার সার। ফুল আর কুঁড়িতে ভরা অন্য আর একদিকে। নীচে পরিচ্ছন্ন নিকোনো উঠোন। তুলসী মাচা। কে থাকে এখানে!

কিছু বলার আগেই চোখ তুলে দেখতে পায়, পুকুর পাড়ে ছিপছিপে চেহারার একটা বুড়ো লোক। মেদহীন পাকানো শরীর। একমনে মাথা নামিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কী যেন পুতছে।

সুমন্ত্র বলল, আমাদের মুরলী। খুব বিশ্বাসী। এই বয়েসেও যথেষ্ট পরিশ্রম করে। আর যা খেতে পারে, দেখলে তাক লেগে যায়। নিজের জন্যে আস্ত এক হাঁড়ি ভাত ফোটায় রোজ—

—কেন ওর আর কেউ নেই?

—নাহ্। ঠিক নিজের বলতে তেমন কেউ নেই। বউ মরে গেছে বছর দশেক আগে। তারপর থেকেই ঘরসংসার ছেড়ে আমাদের সঙ্গেই আছে। ফার্মটার দেখাশোনা, পাহারা এখন সবই ওর হাতে।

—এখানেই থাকে।

—হ্যাঁ। এই জঙ্গল ছেড়ে আর কোথাও বেরোতে চায় না। সন্ধে হলে কাজ সেরে ঘরের দাওয়ায় চুপচাপ বসে থাকে।

—একদম একা! এই বনের মধ্যে? ভয় করে না?

—না, ভয়টয় কিছু নেই ওর। অনুপম বলে ও সারারাত নাকি

বিড়বিড় করে কথা বলে ঘুমের মধ্যে। জেগে থাকলেও একা একা কী বলে। হয়তো এই গাছগাছালিদের সঙ্গেই মনের গোপন কোনও কথা।

—আহা রে, বেচারি! লোকটার জন্যে বড় মায়া হয় তার।

সুমন্ত্র হাসল, অবশ্য ওর একজন গার্লফ্রেন্ডও আছে।

—যাঃ! সতি বলছ?

—হ্যাঁ সত্যিই। প্রায়ই ডিম নিতে আসে ওর কাছে। ডিমওয়ালি; চিন্তা না চিন্তি কী যেন একটা নাম। অনুপম বলতে পারবে ভাল। দুজনে দারুণ ভাব। এলে আর উঠতে চায় না। মুরলী নিজের হাতে পান সেজে খাওয়ায়। বান্ধবীর সঙ্গে তখন নাকি খুব রঙ্গ তামাসা চলে মুরলীর। গল্পগুজবও হয় খানিক।

—খুব ইন্টারেস্টিং কাহিনী তো!

—তা বলতে পার। তবে এমনিতে লোকটা কিন্তু ভীষণ মুখচোরা। কিছু বলতে গেলেই যতো গোলমাল। আধেক কথা মুখে আধেকটা পেটে। ভাল করে চোখ তুলবেই না তোমার দিকে। পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে। অথচ কাজে কোনও ফাঁকি নেই। মুখ বুজেই করে যাবে সারাদিন—

—আশ্চর্য! এমন লোক এখনও আছে!

—তোমার সামনেই বসে আছে। দেখে নাও ভাল করে, শ্রীমুরলীধর বাগাল ওরফে আমাদের মুরলী বা অনুপমের মুল্লি।

মুরলী তাদের সাড়া পেয়ে কাজটা ছেড়ে উঠে এল এদিকে। সুমন্ত্র বলল, কি খবর মুরলী?

—আজ্ঞে ভাল।

দেবযানীকে দেখে মাথা নুইয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে। চিনতে না পারলেও সম্পর্কটা আন্দাজ করে একটু। হাসি হাসি বিনীত ভঙ্গিতে তার হুকুমের জন্যেই অপেক্ষায় থাকে যেন।

সুমন্ত্র বলল, কই, অনুপবাবু কোথায় গেল মুরলী?

— আজ্ঞে ছিলেন তো ওই ফুল বাগানের দিকে। গাছে কলম বাঁধছিলেন। কোথায় গেলেন—

মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে জবাব দেয় সে। কথাটা পুরো শেষ করে না।

—তাহলে যাবে কোথায় ?

—আজ্ঞে আমি একবার খ‍ুঁজে দেখব ?

—না না, কোনও দরকার নেই। আমিই দেখছি।

—একটু চা করব কি—ম‍ুরলী দেবযানীর দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বলে আস্তে আস্তে।

—কী ম্যাডাম, ম‍ুরলীর ওয়াইল্ড টি চলবে নাকি এক কাপ ? স‍ুমন্ত্র হাসল সামান্য।

—আজ থাক, অন্য আর একদিন। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে। কিন্তু হতভাগা অন‍ুপটা গেল কোথায় ?

বলতে বলতে বাগানের দিকেই এগিয়ে গেল স‍ুমন্ত্র। ম‍ুখের দ‍ুপাশে হাত লাগিয়ে গমগমে গলায় চিৎকার করতে লাগল, অ-ন‍ু-প, অন‍ুপম—এই অ-ন‍ু-প-ম—

ও পাশ থেকে প্রতিধ্ব‍নি আসে তার ডাকের। কিন্তু অন‍ুপমের সাড়া নেই। জঙ্গলের মধ্যে পাখিরা ডেকেই চলেছে। নানা রকম বিচিত্র শব্দ উঠছে একসঙ্গে।

স‍ুমন্ত্র দ‍ুপা এগিয়ে আবার চেঁচাল, এই, অন‍ুপম—

এবার যেন সাড়া পাওয়া গেল। খ‍ুব চাপা গলায় ঝাঁকড়া একটা গাছের ভেতর থেকেই ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে ডালপালা-গ‍ুলোও দ‍ুলে উঠল সামান্য।

দ‍ুজনেই লক্ষ করে ব্যাপারটা অবাক হয়ে। ঝিম ধরা শান্ত বনস্পতির মাথায় যেন ম‍ৃদ‍ু চাঞ্চল্য হঠাৎ।

স‍ুমন্ত্র বলল, দেখেছ কাণ্ডটা ছেলের! কোথায় গিয়ে বসে আছে। ঠিক একদিন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তবে ছাড়বে···

পরক্ষণেই ছ‍ুটতে ছ‍ুটতে বেরিয়ে এল সে। দার‍ুণ হাঁপাচ্ছে। জঙ্গল থেকে বেরিরে আসা উদভ্রান্ত চেহারার এক তাজা কিশোর। হয়তো বা কৈশোর ছাড়িয়ে সদ্য যৌবনে পা রেখেছে। কিন্তু সমস্ত চোখে ম‍ুখে ছড়ানো এক ছেলে মান‍ুষী সরলতা এখনও। রোদে পোড়া তামাটে ম‍ুখ। জঙ্গলের ব‍ুনো লতাপাতা লেগে আছে গায়ে মাথায়। শার্টের একটা পকেট ছেঁড়া।

সহসা এই অবস্থায় নতুন মান‍ুষ দেবযানীকে দেখে ভীষণ অপ্রস্তুত যেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

—এই হতভাগা, তুই গাছের মাথায় উঠে বসে আছিস ? আর আমি এদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান তোকে।

অনুপম কী বলবে ভেবে পায় না যেন। তেমনি লাজুক চোখে দেখে দুজনকে।

সুমন্ত্র আবার হাঁকে, গাছের মাথায় উঠে কি কাজ তোর ?

অনুপম অপরাধীর মতো বলে এবার, জারুল গাছে দুটো রেড হুইস্‌কার্স বাসা বেঁধেছে। ডিম দেখতে উঠেছিলাম ওদের।

—রেড হু-ই-স-কা-র্স ! সে টা আবার কী রে ?

—লাল ঝুঁটি অলা, সায়েব বুলবুলি। এক ঝাঁক নতুন এসেছে আমাদের বাগানে।

সুমন তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, শুনলে তো ? এই হল আমাদের অনুপম। কী বলবে একে। হতভাগা নিজে যেমন পাগল, আমাকেও তেমনি পাগল বানিয়ে ছাড়বে একদিন।

অনুপম এবার হাসে একটু তার দিকে তাকিয়ে।

সুমন্ত্র বলল, চিনতে পারছিস ? এই হল তোর দেবযানী দি।

অনুপ মাথা হেলায় হুঁ।

—কতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তোর সঙ্গে দেখা করে যাবে বলে।

অনুপম এবার লজ্জায় ঘাবড়ে গিয়ে হাত দুটো তুলে কপালে ঠেকায় চটপট। একগাল হেসে কী একটা বলতেও গেল। কিন্তু বলল না। চোখ নামিয়ে নিল লজ্জায়।

—কী রে অনুপ, কিছু বললি না ? এই নতুন গার্জিয়ানকে তোর পছন্দ হয় তো ? সুমন্ত্রর গলায় রহস্য।

অনুপম সরাসরি তাকায় এবার। অদ্ভুত সরল হাসিতে মুখটা ভরে গেল। বলল, ভীষণ পছন্দ দাদা—খুউব—

বলেই লজ্জা পেয়ে মুখটা নামিয়ে নিল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই সুমন্ত্রর সেই আকাশ কাঁপানো হা-হা-হাসি পাগলের মতো।

হাসতে হাসতেই আদর করে অনুপমের পিঠ চাপড়ায়। অনুপ পিঠটা বেঁকিয়ে সরে যায়। তবু রেহাই নেই। হাসতে হাসতে সে বলতে থাকে, অনুপবাবু তোমার কোনও জবাব নেই। য়ু আর

এ জিনিয়াস।

দেবযানীও হাসতে থাকে ওদের দুজনের কাণ্ড দেখে।

…রোমাঞ্চ ভরা আশ্চর্য সেই দিনটা এখনও ঘোরে তার চোখের সামনে। সব যেন দেখতে পায় এখনও। খুঁটিনাটি সব কিছু।

ঘেউ ঘেউ করে পল ডেকে উঠল আবার। খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে যেন।

দেবযানীর স্বপ্নের ঘোরটা কেটে যাচ্ছে। ছবিগুলো ক্রমশ ঝাপসা এখন। মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। সে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে।

এক এক করে সব কিছুই সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। এবার হয়তো বাগানটাও যাবে। কিছুই আর থাকবে না সুমনের। অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার কথা প্রায় পাকা। ক্ষেত, খামার, বাগান সবকিছুই। অনুপ না চাইলেও কোনও উপায় নেই। চারদিক থেকেই প্রচণ্ড চাপ। কী করে তা এখন ঠেকাবে দেবযানী।

কাল সকালেই যে আসবে অনুপম। ভাবতে ভাবতে মনটা কেমন ফাঁকা হয়ে আসে। না, আর কিছুই হয়তো করার নেই।

রাতটা শেষ হয়ে এল। দোয়েলের শিস দেওয়া শুরু হয়ে গেছে বাগানে। সিরসির এক ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক।

দেবযানী পায়ের কাছে গুটোনো চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে জড়িয়ে নিল। আবার যেন ঘুম ঘুম পায়। চোখ দুটো বুজে আসছে নতুন করে…

৪

বাইরে কে ডাকে তার নাম ধরে! দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

—বউমা, অ বউমা—। এবার উঠে পড় মা। বেলা যে অনেক হয়ে গেল। খেয়ে দেয়ে তৈরি হয়ে নিতে হবে না তোমায়? সেই কতদূরের পথ… অ বউমা, এবার ওঠো…

পাতলা ঘুমের মধ্যেও মৃদু গলাটা ঠিক শুনতে পায় সে। বুঝতে পারে মা ডাকছেন। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে এসে খুব নরম

গলায় তাকে বারবার ডেকে চলেছেন অরুন্ধতী দেবী, বউমা··· অ বউমা··· ।

ধড়মড় করে উঠে বসল দেবযানী ।

সত্যি অনেক বেলা হয়ে গেছে । উঠে পড়া উচিত ছিল তার । সাড়া দিয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ মা, উঠছি আমি । এখুনি উঠছি··· । আপনি যান— ।

পায়ের দিকের চওড়া জানলা দিয়ে রোদ ঢুকে এসেছে ঘরে । প্রায় বিছানার কাছেই চলে এসেছে গুটি গুটি । তবু সে টের পায়নি । শেষ দিকে হঠাৎ গভীর হয়ে আসছিল যেন ঘুমটা । চোখ খুললেও টের পায় এখনও তার ঝিমঝিমে রেশ । হাত তুলে গভীর আলস্যভরা হাই তুলল একবার । এলো চুলগুলো টেনে বাঁধল ঘাড়ের ওপর ।

চেস্ট ড্রয়ারের মাথায় এলাম ক্লকটার দিকে দেখল । ঘড়িটা বন্ধ । কাল আবার দম দিতে ভুলে গেছে যথারীতি । অভ্যেসটা তার এখনও রপ্ত হল না ঠিক মতো । অথচ ওর কি ভুল হয়েছে এক দিনও ? মনে তো পড়ে না ।

নটা বাজলেই রোজ নিয়ম করে পর পর ঘড়িগুলোতে দম দেওয়া । মাঝে মাঝে ঠাট্টা করত দেবযানী, আমাদের ঘড়িবাবু ! আচ্ছা, তোমাকে সময় করে কে এমন মনে পড়িয়ে দেয় গো ? ঠিক মনে এসে যায় কাজটা ?

—সেই তো ! কে বলতো, সে কে ? সুমন্ত্রর চোখে রহস্য ।

—আমি কি করে জানব, কে তোমার ভেতরে আছে ।

—বোধ হয় আমার মনের মানুষ । বলতে বলতে সুমন হাসত, তাকে কি কখনও জানা যায় ।···আমার মনের মানুষ যে রে···

রহস্য আর হাসিতে ভরা সেই জ্বলজ্বলে মুখটা এখন তার সামনে ছবির মধ্যে বসে । চেস্ট ড্রয়ারের মাথার ওপর থেকে সারাক্ষণ একভাবে তাকিয়ে দেখে তার দিকে । কোনও কথা বলে না আর ! কত ভুল করছে সে । করতে যাচ্ছে আরও । তবু কোনও অভিযোগ, অনুযোগ কিছু নেই । নির্বিকার সুমন শুধু একভাবে হেসে যাচ্ছে ।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ কী রকম অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এলোমেলো ঘূর্ণির মতো একটার পর একটা দৃশ্য। পাক খেয়ে ঘুরে যায় চোখের সামনে। বুকের মধ্যে ঝিম ঝিম করে।

এপাশের টেবিলের ওপর দাঁড় করানো রঙিন বড় ছবিটার দিকে চোখ পড়ে যায়। কী অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে ওরা। গোপালপুরের সি বিচে তোলা ছবিটা। তাদের দুজনের একসঙ্গে পাশাপাশি। শর্টস পরা সুমন্ত্র তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। পিছনে সকালের ধুধু নীল সমুদ্র, ঢেউয়ের মাথায় ফেনার মুক্তো নিয়ে উত্তাল, উদ্দাম। তাদের চোখে মুখেও যেন সেই দুরন্ত উচ্ছ্বাসের ছবি···। বুকের মধ্যে ঢেউ ফেটে পড়ার শব্দ···

দেয়াল আলমারির মধ্যে অন্য আর একটা। একেবারে চুপচাপ গম্ভীর। স্যুট পরা স্মার্ট সুমন্ত্র। ঠোঁটের কোণে লুকোনো চাপা এক টুকরো হাসি যেন। একটার পর একটা ছবি। চারদিক থেকে ঘিরে আছে তাকে। সব সময়, সারাক্ষণ। খানিক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় দেবযানী। না, আর নয়, দেরি হয়ে যাচ্ছে তার।

বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়িই উঠতে হয়। অনুপম এসে পড়বে হয়তো ওদিকে।

হাউস কোটটা চাপিয়ে নিল গায়ে। শীত শীত করছে সকালের হাওয়ায়। চিরুনিটা হাতে নিয়ে একবার আয়নার সামনে দাঁড়াল। একদম এলোমেলো হয়ে আছে। দ্রুত চিরুনিটা টেনে চুলটা ঠিকঠাক করে নেয় সামনের দিকে। মুখটা একটু ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে। বাঁ দিকের গালে দাগ ধরে গেছে তোয়ালের। একটা লম্বা দাগ। আলতো হাতে ক্রিম লাগিয়ে ঘষল কয়েকবার।

নীচে থেকে আবার সরমার গলা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই ভাঙা গলায় হাঁকছে, কই গো বউদিমণি এইসো—। চায়ের জল যে ফুটছে তোমার—

ব্যস, সরমার দায়িত্বটা এই পর্যন্তই। দুবার ডেকে সোজা রান্না ঘরে গিয়ে চায়ের সরঞ্জাম গুছোতে আরম্ভ করে। টি পট, কাপ প্লেট, পর পর সব সাজিয়ে রাখে টেবিলের ওপর। বাকি কাজটা বউদিমণি নিজে এসেই সামলাবে।

মুখ বুজেই চায়ের পর্বটা শেষ হয় আজ। চোখ দুটো ছলছলে দেবযানীর। অরুন্ধতী কিছু বলতে গিয়েও যেন বললেন না। চা শেষ করে রান্নাঘরেই ঢুকে গেলেন আবার।

দেবযানী ঘড়ির দিকে দেখল। সময় বয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আর কিছুই করবার নেই। শুধু দ্রুত তাকে তৈরি হয়ে নিতে হবে সেই কঠিন কাজটি করবার জন্যে। অদ্ভুত এক বিষণ্ণতায় যেন অবশ হয়ে আসে শরীর। হাত-পা অসাড়। কানের মধ্যে বহুদূর থেকে ভেসে আসা এক চাপা গুঞ্জন ধ্বনি···

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। ঠাণ্ডা জলের ধারায় বেশ শীত শীত করে তবুও। জলের সিল্ সিল্ শব্দের মধ্যে সেই চাপা গুঞ্জন। তার সমস্ত শরীর জুড়ে বেজে চলেছে এই মুহূর্তে। বুকের মধ্যে কী একটা কষ্ট! খুব কাছের কেউ একজন তার হাতটা ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কিছুই করার নেই দেবযানীর। এ জীবনে হয়তো আর কখনও তার সঙ্গে দেখা হবে না। অথচ সে যদি এখনও চেষ্টা করে একবার···

শীতল ধারাস্নানে শরীরটা যেন বেশ ঝরঝরে লাগে। রোদে পিঠ দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে একটুক্ষণ। দেবদারু গাছের মাথায় একটা দোয়েল এসে বসেছে। মিষ্টি সুরে শিস দিয়ে যাচ্ছে মুখ তুলে। কুচকুচে কালো গলা, সাদা বুকের পুরুষ পাখিটা। অনুপ বলে, ম্যাগপাই রবিন। গলা ফুলিয়ে আবার ডাকল পাখিটা তার দিকে। মন উদাস করা এক করুণ সুর—

অরুন্ধতীদেবী এসে বললেন, কই বউমা এসো, ভাত দিয়েছে তোমার। যা পার চাট্টি মুখে দিয়ে নাও মা। কত দূরের পথ, কখন ফিরবে তারও ঠিক ঠিকানা নেই।

—হ্যাঁ মা, চলুন।

—তারপর অনুপ তো একটা পাগল। এসে পড়েই হয়তো তাড়া লাগাবে। তার আগেই যা হোক মুখে দিয়ে নাও।

এত সকালে খেতে ইচ্ছে করে না একটুও। খিদেও নেই তার। কিন্তু অরুন্ধতীদেবীর মুখের ওপর কিছু বলতে আটকায়। দুঃখ পাবেন।

টেবিলে গিয়ে বসেই পড়ল অগত্যা। সরমা প্লেট সাজিয়ে অপেক্ষা

করছিল তার জন্যে। চুপচাপ চারটি মুখে দিয়ে নেয়।

অরুন্ধতীদেবী নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, সবই কপাল আমার! আমি আর কী বলব মা। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমার আর কোনও কিছুতেই আপত্তি নেই, আ—! শুধু তুমি—

কথাটা শেষ করতে পারলেন না। চোখে জল ছাপিয়ে গলা আটকে গেল। চাপা কান্নার শব্দ।

দেবযানী মুখ তুলে তাকায়। তাকিয়েই থাকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে।

পরে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলান অরুন্ধতী। বললেন, তুমি খুশি হলেই আমি খুশি। আমি আর কিছু চাই না মা—

দেবযানী কোনও কথা বলে না। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার মুখ নিচু করে ভাতগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

খাওয়াটা কোনমতে শেষ করেই আবার ঘরে এল দেবযানী। বন্ধ হয়ে থাকা ঘড়িটা টেনে নিয়ে সময় মিলিয়ে দিল ঠিক করে। নিজের ক্ষুদে হাত ঘড়িটার দিকে দেখতে থাকল। ইস্পাত রঙের কালো ডায়াল। সোনালি কাঁটাটা টিক টিক করে লাফিয়ে চলেছে তার ওপর দিয়ে। তবু এখনও সময় আছে। দশটা সাড়ে দশটার আগে অনুপ আসবে কি? মোটামুটি ধীরে সুস্থেই তৈরি হয়ে নিতে পারবে তার মধ্যে।

বারান্দায় এসে আবার একটু দাঁড়ায় দেবযানী। মাঠটা রোদে খাঁ খাঁ করছে। লাল কাপড় পরা একটা বউ মাথায় এক বোঝা ঘাস নিয়ে চলে যাচ্ছে ওপারে। ঝিলমিলে ইউক্যালিপটাস পাতার ঝালরের মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে তাকে।

—চাই থালা বাসন-উন্…ঢং ঢং—।

এদিকের রাস্তায় হঠাৎ ফেরিওয়ালার ডাক। চমক লাগে যেন। চিৎকার করে তার দিকেই হাঁক দিল লোকটা। তারপর ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে দূরের দিকে চলে গেল। অনেক দূর থেকেও ধ্বনিটা ভেসে আসে ওদের, চাই বাস্…উ…ন্…। কেমন কাঁপা কাঁপা বিষণ্ণ এক সুর। মন উদাস হয়ে যায়!

তখনই যেন চোখে পড়ল চেহারাটা দূরে। অনুপম? হ্যাঁ সেই তো! কোনও ভুল নেই।

গাছের আড়াল থেকে ঝাপসা মূর্তিটা এবার স্পষ্ট। গম্ভীর মুখে সোজা হেঁটে আসছে। এখন বেশ একটা ব্যক্তিত্ব এসে গেছে চেহারায়। যেন অন্যরকম লাগে।

তাকে এখনও দেখতে পায় নি সে। মুখটা এদিকে তুলছেই না। সামনেই একটা সাইকেল দুপাশে দুধ ঝুলিয়ে মুখোমুখি ব্রেক চেপে দাঁড়িয়ে গেল। আলতো পাশ কাটিয়ে গেল অনুপম। খেয়াল করে না লোকটার দিকে। চলকে পড়া দুধের দিকেও। যেন ভীষণ অন্যমনস্ক। কী ভাবছে?

আজ শেষবারের মতোই সে বাগানটায় যাচ্ছে। সে আর দেবযানী। মনে মনে হয়তো দারুণ মুষড়ে পড়েছে তার জন্যে। আজ—আজই তাদের দুজনের সামনে এটা অন্য আর একজনের হাতে চলে যাবে। কথাবার্তা ব্যবস্থা প্রায় পাকা হয়ে আছে।

তার আর সুমন্ত্রের দুজনের হাতে গড়া সেই স্বপ্নের বাগান, খামার! ফুল ফল আর ফসলের প্রিয় খেত!

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা কাছে এসে অনুপ ওপরের দিকে তাকাল। আশ্চর্য! এই এত বেলায় সুমন্ত্রর সেই বটলগ্রিন রঙের পুলওভারটা পরে এসেছে। গরম হবে না? শীত তো প্রায় শেষ। ফাল্গুনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। তার মধ্যেও ও স্বচ্ছন্দে চাপিয়ে এসেছে ওটা! কে জানে বাগানে হয়তো এখনও শীত ফুরোয়নি। চলছে কাঁপন ধরানো সেই হু হু শীতের হাওয়া।

পুলওভারটা কিন্তু দারুণ মানিয়েছে অনুপমকে। হঠাৎ দেখলে যেন বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে দেবযানীর। দুজনেই তো মাথায় সমান সমান। ঠিক যেন সে হেঁটে আসছে। সুমন! না না, এক পলক দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিল দেবযানী। বুকের মধ্যে কী রকম করে ওঠে সহসা।

কয়েকদিন আগে এটা সে নিজের হাতেই তুলে দিয়েছিল অনুপমকে। অনুপ নিতে চায়নি প্রথমে। দুঃখী দুঃখী মুখে খুব সঙ্কোচ নিয়ে তাকিয়েছিল দেবযানীর দিকে। এই পুলওভার গায়ে তার সমুদার চেহারাটা যেন ভুলতে পারছে না সে।

করুণ চোখে তাকিয়েই থাকে।

দেবযানী বলল, আমি দিচ্ছি—তুমি পরলেই খুশি হবো। নাও এটা অনুপ···।

মুখ ফুটে অনুপ কখনও কিছু চাইতে পারে না। তার কাছে তো নয়ই। সুমনের কাছে কখনো সখনো হয়তো পারত।

একটা চাকরির জন্যে খুব বলত ইদানীং। পাশটাশ করেও শুধু এই বাগান-খামার দিয়ে পড়ে থাকবে চিরকাল। বাড়ির সবাই, আত্মীয় স্বজনেরা নানা কথা বলছে। তারাই পরামর্শ দেয়। এখন সুমন্ত্রকে ধরে তার অফিসে বা কোনও একটা আফিসে ঢুকে পড়তে।

কিন্তু সুমন একেবারেই আমল দিল না কথাটা। প্রায় ধমকে উঠেছিল।

—হতভাগা! তোর মতলবটা কি বলত? তুই ছেড়ে যাবি আমাকে?

—না সমুদা, কক্ষনো না। আমি কখনও যাব না।

—তাহলে যে হঠাৎ চাকরির কথা ভাবছিস?

—সবাই বলছে ভবিষ্যতে কথা ভেবে···আমতা আমতা করে মাথাটা নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অনুপ। আর কথা ফোটে না মুখে।

—ঠিক আছে, তোর ভবিষ্যৎ আমি দেখব। এইটেই তোর ভবিষ্যৎ। কালই লেখাপড়া করে দিচ্ছি, এই বাগান খামারের যা আয় হবে, তার পুরো অর্ধেক অংশ তোর। কাল থেকে তুইও এর একজন মালিক। ঠিক আছে?

—উরি ব্বাস্! না, সমুদা না। ওসব আমার কিছু চাই না। এটা যেমন আছে তেমনি থাক।

সুমন্ত্র হাসল, ঠিক আছে। সে আমি বুঝব। তোকে আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না এখন। নিজের কাজ করে যা—।

অনুপম আর কোনও জবাব দেয় না। প্রায় পালিয়ে যায় সামনে থেকে।

বেচারি অনুপম! বাগানটা নিয়ে তারও স্বপ্ন কিছু কম ছিল না। তবু কেন যে চাকরির জন্যে ঝোঁকটা চেপে বসেছিল হঠাৎ!

কাগজ দেখে দেখে অ্যাপ্লিকেশান করাও শুরু করেছিল। কিন্তু সাড়া পেল না কোথাও। অবস্থা দেখে পরে সুমনই উদ্যোগ

নিয়েছিল। কথাবার্তাও অনেকটা এগিয়েছিল। সুমনের অফিসেই হয়তো হয়ে যেত। কিন্তু আর তা সম্ভব হল না। সবই মানুষের ভাগ্য।

রোদের মধ্যে রঙিন সোয়েটারটা ঝকমক করে উঠছে অনুপমের গায়ে। গায়ে সুমনের চেয়ে একটু রোগাটে, তবু বেশ মানিয়ে গেছে। আকাশে মাথা তুলে সোজা এগিয়ে আসছে তার সামনে।

এ বছরই এটা দিয়েছিল বের করে তাকে। শীতের মধ্যে একটা ছেঁড়া-খোড়া সোয়েটার পরে ঘুরতে দেখে মায়া হয়। তাই নিজেই হাতে করে তুলে দিয়েছিল দেবযানী। কী করবে আর এগুলো সব জমিয়ে রেখে?

কিন্তু স্যুটকেশ খুলেই হঠাৎ মুষড়ে পড়েছিল। অবশ হয়ে আসছিল তার হাত। পুলওভারটা নিয়ে ঝিম ধরে বসে থাকে। তীব্র সেই চেনা গন্ধের ঝলক। কোথায় কতদূরে থেকে ছুটে আসছে তার কাছে···

ফাঁকা রাস্তায় হু হু করে ঝড়ের বেগে বাইক ছোটায় সুমন্ত্র। পিছনে দেবযানী, পুলওভার পরা তার চওড়া কাঁধে গাল ঠেকিয়ে··· বুকের মধ্যেই এক একবার লাফিয়ে উঠছে সুমনের বলিষ্ঠ শরীরটা ···কথার শব্দগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে হাওয়ায়, উড়ে যাচ্ছে উদ্দাম হা-হা-হাসির শব্দ···আর তার মধ্যেই যেন ভাসতে ভাসতে ছুটে চলেছে দুজনে···

মুখ ডুবিয়ে সেই গন্ধটাই পায় দেবযানী। সুমন্ত্রর ঘ্রাণ! চিনতে কোনও ভুল নেই। মনটা সহসা দমে যায় একবার। এমনি করে সে কি সুমনকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে কাছ থেকে?

পরক্ষণেই মনে হয়, না না, তা কেন? সে নিজে হলেও এটা করত। এখনও নিশ্চয়ই খুশি হবে, তার অনুপ এটা পরলে।

চুপি চুপি আর একবার গভীর গন্ধটা টেনে নেয় দেবযানী। তারপর এ ঘরে এসে অনুপের হাতে দিল, এই নাও। এটা তুমি পরে নাও।

—না না সে কি! প্রায় চমকে তাকায় অনুপ।

—কেন, কী হয়েছে! এটা সুন্দর মানাবে তোমাকে। আমি

খুশি হব, তুমি এটা পরলে অনুপ—

—আমি···

কিছু বলতে গিয়েও কথাটা যেন সামলে নিল সে। দেবযানীও চুপ। পুলওভারটার দিকেই নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দুজনে। যেন অন্য আর একজনের উপস্থিতি সেখানে। দুজনেই এড়িয়ে যেতে চায় যে প্রসঙ্গটা।

পরে মুখ নামিয়েই পুলওভারটা হাতে নিয়ে উঠে গেল অনুপম। তার সামনে ও আর নামটা উচ্চারণ করবে না সুমন্ত্রর। কেউ করবে না।

অথচ আগে অনুপের মুখে সমুদা ছাড়া কথা ছিল না। সব সময়ই উচ্ছ্বসিত। নিজের ভাই নয় সুমন্ত্রর। অনেক দূরের কী রকম একটা সম্পর্ক। কিন্তু সে এমন কিছু নয়। তার চেয়েও অনেক বড়ো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দুজনের ভিতরে ভিতরে। দেখা হলেই মজার মজার গল্প। আর নানা রকম পরিকল্পনা। একদিনও কামাই নেই। সেই প্রায় তিরিশ মাইল দূর থেকে রোজ সকালে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে আসা। তবু প্রতিদিন কী উৎসাহ তার চোখে-মুখে।

সত্যিই অনুপমের কোনও তুলনা নেই। বাগানটাই ছিল যেন তার প্রাণ। সুমন বুঝত সেকথা। তাই ছেলে মানুষ হলেও অনুপের মতামত না নিয়ে কোনও কাজে হাত দিত না। দেবযানীর মনে হত, অনুপই যেন এ ব্যাপারে একমাত্র বন্ধু সুমন্ত্রর। বন্ধু এবং পরামর্শদাতা।

মনে আছে বিয়ের আগে অনুপম তাকে বলত, দেবযানীদি। বিয়ের কিছুদিন পরই শুরু করল, ঝিনিদি!

দেবযানী চোখ পাকিয়ে বলত, কেন, আমাকে বউদি বলবে না?

—না। আমার দিদি বলতেই ভাল লাগে। তুমি কি রাগ করবে তাহলে?

—পাগল ছেলে। রাগ করব কেন? কিন্তু 'ঝিনিদি' কেন? এই কি আমার নাম?

—না। কিন্তু আমাদের বাগানে সারাদিন এই রকম একটা

শব্দ ওঠে, ঝিন্ ঝিন্ ঝিনি ঝিনি···। একটু খেয়াল করে দেখো, তুমি। দূর থেকেই ভাল শোনা যায়। তার সঙ্গে মিলিয়ে এই ঝিনি। নামের সঙ্গে বাগানের শব্দটা মিশে থাকবে আমাদের··· পছন্দ নয় ?

ব্যাখ্যাটা শুনতে শুনতে সারা শরীরে যেন রোমাঞ্চ অনুভব করে দেবযানী। হাসে চোখ তুলে। কাঁপা গলায় বলে, আমি বুঝি একটা বুনো মেয়ে !

পরে কপট ধমক লাগিয়ে হাসতে হাসতে বলল, এক নম্বরের ক্ষ্যাপা ছেলে তুমি, জানলে ?

অনুপমও হাসে তার সঙ্গে ছেলেমানুষের মতো।

৫

ক্ষাপামি কি সুমনেরও কম ছিল নাকি !

বিয়ের পরই সে কি কাণ্ড ! দারুণ জল্পনা-কল্পনা তাদের হনিমুন ট্রিপ নিয়ে। কোথায় যাওয়া যায়। দুজনের মতের মিল হচ্ছে না কিছুতেই।

দিন কুড়ি মাত্র ছুটি। আগে ঠিক ছিল গোয়ায় যাবে। দেবযানীর পছন্দ।

পরে সুমন্ত্রর প্রস্তাব, গোয়া থাক। বরং মানালিই চল। আগে তো পাহাড়ে যেতে চেয়েছিলে, না ? খুব সুন্দর হবে কুলু-মানালি। চারিদিকে পাহাড়, ঝর্ণা, চেস্টনাট আর আপেলের অরচার্ড। সারি সারি স্নো-পিক্। আর অগাধ নির্জনতা। তারপরও আছে বিয়াশ। ফ্যান্টাসটিক্ ! বলো ?

দেবযানী হাসে, বেশ তো। তোমার যখন পছন্দ, তাই চলো—।

একদফা অনুপমের সঙ্গেও আলোচনা চলে। তারপরই হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল। আরে তাইত ! একেবারে নভেল আইডিয়া ! দারুণ বলেছিস তো—

—আবার কী হল ? দেবযানী অবাক হয়ে বলে।

—ওহ্ হো, একেবারে আদর্শ জায়গাটা তো আমাদের হাতের

কাছেই। তোমার এই বাগান! চারদিকে এমন সুন্দর পরিবেশ। নির্জন, নিস্তব্ধ। শুধু পাখির গান, ফুলের গন্ধ···ভাবো একবার।

—কী বলছ তুমি!

—হ্যাঁ দেবী। সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে এখানে।

দেবযানী কিছু বলতে পারে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

—সুন্দর নিরিবিলি পরিবেশে, গাছ-গাছালির মধ্যে, গঙ্গার একেবারে ধার ঘেঁষে, একটা ঘর বানিয়ে নিই যদি, আমাদের পছন্দমতো?

—নতুন ঘর বানাবে?

—হ্যাঁ তাই তো। দেখবে দারুণ হবে। কোনওদিকে কোনও ঝুট-ঝামেলা নেই, ভিড় নেই, গোলমাল নেই—চারিদিকে শুধু সবুজ আর নির্জনতা। রাত্তির হলে গা ছমছম করবে জঙ্গলের মধ্যে, অদ্ভুত লাগবে তখন ঘরের মধ্যে বসে বসে গল্প করতে। তোমার ভয় করবে না তো? ভয়ের কিছু নেই, আমি তো থাকছি···

অদ্ভুত উচ্ছ্বাসভরা সেই পাগলামিতে সায় না দিয়ে আর উপায় থাকে না দেবযানীর।

সঙ্গে অনুপমও পাগল হয়ে ওঠে যেন। রীতিমতো উৎসাহিত। শেষ পর্যন্ত তার পরিকল্পনাটাই পছন্দ হয়েছে সমুদার। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে!

তারপর দুজনে মিলে রাতারাতি চলে সেই ঘর বানানোর উদ্যোগ। লোকজন, জিনিসপত্র, মশলা, মিস্ত্রি নিয়ে একেবারে হৈ হৈ কাণ্ড!

নতুন একটা খেলা নিয়েই যেন মেতে উঠল দুজনে। সঙ্গে মুরলীও জুটল কয়েকজন লোক নিয়ে। নকশাটা নিজের হাতেই সুন্দর করে বানাল সুমন্ত্র। বিলিতি ধরনের খড়ের বাংলোঘর। ছবিটা দেখে খুবই পছন্দ হয়। খড়ের চাল দেওয়া পরপর দুটো দক্ষিণমুখী ঘর। পিছনে ছোট টয়লেট। জলের লাইন টানা টিউবেলের পাম্প থেকে। সামনে লাল মোরাম। লন। রঙিন গেট। সব মিলিয়ে চমৎকার ছিমছাম একটা কটেজ।

অনুপম আবার সুন্দর কাঠের ফলক লাগিয়ে নামকরণ করে দিল বাড়িটার—'দেবযানী কটেজ'।

সুমন্ত্র খুব তারিফ করে দেখে, বাঃ চমৎকার হয়েছে। ওয়ান্ডারফুল!

—আর বাগানটা?

—এটাও দারুণ করেছিস। কিন্তু দুটো ঝাউ চাই গেটের দু-পাশে। আর সিঁড়ির মুখে পাম্।

—নো প্রবলেম। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মাথা নেড়ে হাসল অনুপ, চাইলে একটা ফোয়ারার চেষ্টাও করতে পারি।

—না না আর দরকার নেই। এই খুব সুন্দর লাগছে।

দেবযানীও এল নিজের চোখে সব দেখতে একবার। পাশাপাশি দুজনে ঘুরে ঘুরে দেখে। ছোট্ট কটেজটার চারদিকে ধূ ধূ প্রান্তর, সব্জি খেত। বনটিয়ার দল উড়ে যাচ্ছে। মৌরি-সর্ষের চাষ হয়েছে একধারে। ওদিকে গাছ-গাছালির আড়ালে মটরশুঁটির জমি। অদ্ভুত একটা তাজা বুনো গন্ধ বাতাসে। তার মধ্যেই এপাশে জড়াজড়ি করা দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়ার আড়ালে ছবির মতো 'দেবযানী কটেজ।'

ঘরের সামনেই খোলা জমিতে আবার অনুপম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুলের টব বসিয়েছে। চারা গাছও পুতেছে অনেক। কুন্দ, কামিনী, রজনীগন্ধা, রঙ্গন পরপর সাজানো দুপাশে।

সব দিক থেকেই সুন্দর আর ছিমছাম। দেখে যেন চোখ ফেরে না তার। এমন একটা ব্যবস্থার কথা কল্পনাও করতে পারেনি দেবযানী।

অনুপম বলে, ঝিনিদি তোমার পছন্দ তো? বলো?

দেবযানী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। কী বলবে সে এই পাগল ছেলেটাকে! একটু লজ্জাও করে যেন।

—তোমাদের পাহাড়ে যাওয়া আটকে দিলাম বলে, রাগ করোনি তো?

দেবযানী হাসল, তোমার কী মনে হয়?

—আমার তো মনে হয়…এটাই…আড়ষ্ট হয়ে কথাটা শেষ

করতে পারে না অনুপম। মুখটা লাল।

দেবযানী রহস্য করে বলল, হ্যাঁ ভালই। আমাদের বনবাসের একটা ভালই ব্যবস্থা করেছ। আর কি, জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে আর জপতপ করে সারাদিন কাটাব এখানে।

—না না, তা কেন? সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখানে।

—কী হবে শুনি।

—ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও ঝিনিদি। রোজ টাটকা বাজার, ফল, সব্জি, মাছ, মাংস—যা দরকার সব এসে যাবে তোমার দরজায়।

—তারপর?

—তারপরও আছে। চিন্তাকে সকাল হলেই পাঠাবে মুরলী। তোমার সব কাজ করে দিয়ে যাবে রোজ। দরকার পড়লে আমিও এসে যাব। তুমি শুধু হুকুম করবে যখন যা দরকার। আর হঠাৎ দরকার হলে, দু-পা এগিয়ে একবার মু-র-লী বলে হাঁক দেবে—। সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পাবে। মুরলীদা কখনও ঘুমোয় না।

—তারপর, আর কিছু না?

—আর? হ্যাঁ, ইচ্ছে হলেই গঙ্গার দিকে বেড়াতে যাবে। বিশেষ করে বিকেলবেলা। ঘাটে নৌকো বাঁধাই থাকে। বোটিংও করে আসতে পারো এক চক্কর। যেমন খুশি তোমার। যতোদূর ইচ্ছে···

—তারপর?

—আর জানি না। লজ্জা পেয়ে হঠাৎ থামল অনুপম। পরে বলল, তোমার কি সত্যিই আফসোস হচ্ছে ঝিনিদি, টিকিট ফিরিয়ে দেওয়া হল বলে? দূরে কোনও পাহাড়ে বা সমুদ্রে গেলে না বলে?

—ভাবছি। দুচোখে রহস্য তার।

—আমার তো মনে হয়, তুমিও ভালবাসো এই বাগানটা। এই সবুজ খেত-খামার, অরণ্য, পাখির গান। সারাদিন ধরে ঝিঁঝি ডাকা এই নির্জনতার মধ্যে তুমি নিজেও তো মিশে আছ ঝিনিদি···

দেবযানীর বুকের মধ্যে কাঁপন ধরিয়ে দেয় এবার অনুপম। ছবিগুলো যেন দেখতে পায় চোখের সামনে। গলাটা বুজে আসে আবেগে। তবুও হাসল মৃদু। বলল, তুমি একটা বদ্ধ পাগল! বুঝলে?

অনুপম অবাক হয়ে তাকায় তার দিকে।

মনে পড়ে কটেজে তাদের সেই প্রথম রাত। চোখ বুজলে আজও দেখতে পায় সামনে। সারা শরীর মন জুড়ে এক অদ্ভুত শিহরণ!

তখন জ্যোৎস্না রাত। কটেজের বাইরে নরম ঘাসের ওপর সুজনি বিছিয়ে বসে আছে দুজনে। বসেই আছে। চারদিকে গাছগাছালি, ফুলের বাগান। থেকে থেকে ঝড়ের মতো ছুটে আসছে গঙ্গার হাওয়া। দেবদারু গাছগুলো নেশাগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে। মৌরিফুলের মিষ্টি গন্ধভরা মধ্যরাতের হাওয়া। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় দুজনে। কোনও কথা নেই। নিশিতে পাওয়া এক অলৌকিক মুহূর্ত। সব কিছু স্বপ্নের মতো। আকাশে উড়ে চলে নিশাচর বকের দল। জ্যোৎস্নার মধ্যে তাঁদের ডানার সাঁই সাঁই···কঁ-অ ক—কঁ-অ ক করা এক চমক লাগানো ডাক···

কী অদ্ভুত পাগলামিতে পেয়ে বসে তখন তাদের। না, সুমন্ত্র ঘরে যাবে না কিছুতেই। সেখানেই খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকবে। আর একের পর এক গান শুনবে দেবযানীর। আহ্ কী অভাবনীয় এক রাত জীবনের!

গানের মধ্যেই তাদের আদরের পালা কখনও। একবার জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠল ভুতুড়ে গলায়। কী ভয় পায় দেবযানী। ভয়ে আবেগে প্রবল ভাবে সুমনকেই জড়িয়ে ধরে আবার। সমস্ত শরীরটা যেন কাঁপছে।

সুমন মজা পেয়ে হাসে হা-হা করে। শক্ত হাতে তাকে বুকের মধ্যে মিশিয়ে নিজেই একবার ভয় দেখায় পাখির ডাকটা নকল করে।

—এই না না। প্লিজ। নরম উষ্ণ ঠোঁট দুটো চেপে সুমনের ডাকটা বন্ধ করে দেয় দেবযানী।

চিন্তা রান্না করে রাতের খাবারটা রেখে গেছে তাদের। ধবধবে বিছানায় টান টান করে টাঙানো নীল মশারি। চারদিকে ফুল, ফুলের ঝালর। মাথার কাছে রাখা জলের গ্লাস, কুঁজো। মৃদু

টিমটিমে আলো।

কিন্তু সব পড়ে থাকে। কেউ যেন আর ঘরে যাবে না আজ। বিভোর হয়ে এই খোলা হাওয়ায় চাঁদের আলোর মধ্যেই কাটিয়ে দেবে রাতটা। নিশিতে পাওয়া প্রাণীর মতোই তাকিয়ে থাকবে সেই থমথমে জঙ্গলের দিকে।

—এই কী ভাবছ তুমি, বল না? সুমন তার চোখের দিকে তাকায়।

দেবী মাথা নাড়ে, না, কিছু না।

—নিশ্চয়ই তুমি কিছু ভাবছ। কার কথা?

—তোমার কথা। গলাটা বুজে আসে দেবযানীর। শুধু…

আবার তাকে প্রবল আবেগে আলিঙ্গন করে সুমন্ত্র। আবার সেই খোলা আকাশের নীচে মাঠের মধ্যেই উদভ্রান্তের মতো মিলিত হলো তারা। দেবযানী মুখে একবার না না বলেও বিহ্বল হয়ে পড়ে তার তীব্র আদরের মধ্যে। দস্যুর মতো সব পোষাকগুলো এক এক করে দ্রুত টেনে নিচ্ছে সুমন্ত্র। বাধা দিতে গিয়ে উল্টে সে আরও প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরছে তাকে। উন্মুক্ত সব আবরণ তার। স্তন, নাভি, জঙ্ঘা....

এক অবশ স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে সে। কানের কাছে পাগলের মতো মুখ ঘসছে সুমন্ত্র। আর বিড় বিড় করে কাঁপা গলায় বলছে দেবী, এই আমাদের হানিমুন! আমাদের মধুযামিনী! কতদিন আমি অপেক্ষা করেছিলাম এই সুন্দর রাতটার জন্যে। আজ আর কোনও বাধা নয় দেবী…

তখন চরাচর ভরা এক মায়াবী চাঁদের আলো। চোখ দুটো বোজা তার। তাহলেও অনুভব করতে পারছিল। তাদের দুজনকে ঢেকে দিচ্ছে সেই সোনালি আলোর ঢল। গলে পড়ছে বিন্দু বিন্দু সারা শরীর জুড়ে। আসছে মৌরি ফুলের ঘ্রাণ। সেই রাত পাখিদের উড়ে যাওয়ার শব্দ…

সুমন্ত্র তখনও শান্ত হয় না। কিছুতেই যেন আশ মেটে না। ধবধবে জ্যোৎস্নার মধ্যে অবাক চোখে তাকিয়েই থাকে তার দিকে। চাঁদের আলোয় তার তীব্র নগ্ন শরীর। আবার হাত বাড়িয়ে দেয়। স্তনের খাঁজে জড়াজড়ি করা তার একগুচ্ছ তিল। ধবধবে

বুকের মধ্যে যেন অদ্ভুত সুন্দর এক নকশা বানিয়ে আছে।

সেটা ছুঁয়ে আদর করতে করতে বলে, আহ্ দেবী! দেবযানী, তুমি যে তিলোত্তমা—আমার তিলোত্তমা!

আশ্চর্য সেই আচ্ছন্নতা! সময় যেন থেমে আছে চারপাশে। শরীর জুড়ে এক অবোধ্য সুখের যন্ত্রনা ঝিম ঝিম করে বেজেই চলেছে। ঝিঁঝি ডাকা নিস্তব্ধ বনভূমির প্রতিধ্বনির মতো।

ততক্ষণে আবার মেতে উঠেছে সুমন্ত্র। প্রচণ্ড আদরের মধ্যে বিবশ করে ফেলছে তাকে। হারিয়ে যাচ্ছে দুজনেই সেই অগাধ সমুদ্রের অতলে। মুখে শুধু সুমন…সুমন…নামটা প্রলাপের মতো বলে চলেছে বারবার।

কী আশ্চর্য সেই অদ্ভুত পাখিটা! এখনও মনে আছে। ডেকে উঠেছিল একেবারে মুখের সামনে এসেই। তার ডাকেই পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল। গভীর ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলে তাকাল দেবযানী।

জানলাগুলো খোলা। বাইরে তার আগেই জেগে উঠেছে ঝলমলে সবুজ এক সকাল। সকালের আলো। ঘরের মেঝেতে লম্বা এক ফালি রোদ্দুর। সুমন ঘরে নেই। কখন উঠে গেছে পাশ থেকে টেরই পায় নি। অঘোরে ঘুমুচ্ছে দেখে হয়তো আর ডাকেনি তাকে। প্রায় শেষ রাতের দিকে ঘরে এসে শুয়েছিল তারা। তারপর আর মনে নেই। শুতে না শুতেই অচৈতন্য একেবারে।

পাখিটা জানলায় বসে মুখের ওপর তেমনি ডেকে উঠল আবার, ছিছিক্—ছিছিক্। ছিক্—।

দেখে বেশ মজা পায় দেবযানী। এক ফোঁটা পাখিটার ডাকে কী তেজ! রঙিন রোঁয়াভরা গলাটা ফুলিয়ে ফুলিয়ে যেন বকে চলেছে তাকে। কোনও যেন ভয় নেই।

ঘুমভাঙা চোখে দেখতে দেখতে হেসে ফেলে সে। হঠাৎই হাসি পেয়ে যায়। পাখিটা তবুও ডাকে। মনে হয় যেন এই সংসারেরই কোনও রহস্যপ্রিয় প্রতিনিধি। নতুন একজন মানুষ দেখে ঠাট্টা জুড়ে দিয়েছে এসে। কাল রাতে তাদের এমন বে-আব্রু উদ্দামতা দেখে বকাঝকা করছে একটু।

বারবার বলছে, ছি, ছি! ছিছিক্! ছি, ছি! লজ্জা করছে না?

সঙ্গে আবার উল্টেপাল্টে হালকা শরীরটাকেও নাচায়। লাফ দিয়ে নেমে পড়ে ঘরের মধ্যে। খুনসুটি ভরা গলায় তেমনি ডাকে, ছিছিক—ছি! কোনও সঙ্কোচ নেই দেবযানীর কাছে। এক বুনো সখির মতো রাতের কথাগুলো মনে করিয়ে দিয়েই যেন ঠাট্টা করছে বারবার। ছি, দেবী ছি! কী কাণ্ড তোমাদের, বল তো?

দেবযানী তাড়ায় না পাখিটাকে। ঘুম ভাঙা অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বসে বসে রাতের কথাগুলো ভাবে।

পরে সুমন্ত্র আসতেই একবার দেখাতে চেষ্টা করেছিল পাখিটাকে। তখন উড়ে গেছে কৃষ্ণচূড়ার ডালগুলোর মধ্যে। তবুও দেখাল দূর থেকে মজার পাখিটাকে। ডাকও শোনাল তার, নরম মিহি গলায়। ছিছি—ছিক—ছিছিক···

সুমন্ত্র হাসল তার গালটা দু-হাতে চেপে, বাঃ চমৎকার! হাও সুইট! এবার সত্যি তুমি ওদের একজন হয়ে গেছ, দেবী। দেখছ তো, সকাল হতেই কী রকম আলাপ জুড়ে দিয়েছে এসে। এই তো সবে শুরু, হানি। দেখবে আরও কত সঙ্গী জুটবে তোমার এখানে। একেবারে নতুন ধরনের। নেশার মতো টানবে তোমাকে।

কিন্তু সুমন্ত্র পাখিটার নাম বলতে পারল না। অনেকবার দেখার চেষ্টা করেও না। বলেছিল, অনুপ জানে নিশ্চয়ই। হতভাগা আসুক একবার। দেখিয়ে দিও, ডাকটাও শুনিও। ঠিক বলে দেবে। ও দারুণ একস্‌পার্ট এ ব্যাপারে।

দেবযানী মাথা নাড়ল, ঠিক বলেছ। একবার শুনলেই পিছন পিছন ধাওয়া করবে।

টুং টাং শব্দ শোনা গেল ওদিকে। চিন্তা বোধ হয় আজ এসে পড়েছে এর মধ্যেই। কোনও সাড়াশব্দ না দিয়েই চা বানাতে শুরু করেছে তাদের। সুমন্ত্র তাকে ছেড়ে চট করে সরে দাঁড়াল একপাশে।

দেবযানী হাসল কটাক্ষ করে। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গেল টয়লেটের দিকে। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিল বারবার। মাথার

চুলটা ঠিকঠাক করে নিল। তারপর দ্রুত ফ্রেশ হয়ে নিয়ে হাউস কোটটা চাপিয়ে ছোট টেবিলের সামনে এসে বসল।

বড় একপট চা ট্রেতে সাজিয়ে রেখে গেল চিন্তা। এক মুখ ঘোমটা দিয়ে এসে রাখল সে। যেন তাদের দিকে তাকাতে খুবই লজ্জা। বিশেষ করে বাবুর সামনে নতুন বৌদির দিকে।

সুমন্ত্র আড়চোখে তাকিয়ে হাসল দেবযানীর দিকে। দেবীও হাসে নিঃশব্দে। তারপর পাশাপাশি বসে দুজনের চা-পান সকালের।

বাইরে তখন রোদ্দুরটা জ্বলজ্বল করে উঠছে। প্রজাপতি উড়ছে ফুল বাগানে। অজস্র পাখির ডাক চারদিকে। নানা বিচিত্র শব্দের এক অদ্ভুত গুঞ্জন। এই বনভূমির আবেশ ভরা কোনও সঙ্গীতের মতো। পাখিটাও নিশ্চয়ই আছে দলে। আছে কি?

অনুপম এলে একবার পাখিটাকে দেখাতে হবে। যদি খুঁজে পায়। ডাকটাই না হয় শুনিয়ে দেবে। ভীষণ মজা পাবে ও। উত্তেজিত হয়ে উঠবে রীতিমতো। মনে মনে ভাবে দেবযানী।

অনুপম তো বরাবরই তাই। সব ছেড়ে আগে পাখি, ফুল, গাছ, পতঙ্গ ও প্রজাপতি। তাই নিয়েই যতো কৌতূহল আর মাথা ব্যথা। ভালোও বাসে বটে। কখনও ক্লান্তি নেই, আলস্য নেই। ভর দুপুরেও দেখা যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছে। কলম বেঁধে নতুন জাতের ফুল তৈরি, আর নতুন কোনও পাখি দেখলেই তার পিছন পিছন ধাওয়া করা—এ দুটোই তার প্রিয় শখ। আর সঙ্গে যদি কেউ তাল দেয় একটু, উৎসাহ দেখায় কোনও, তাহলে তো আর কথা নেই। উৎসাহে পাগলের মতো ছটফট করে। সত্যিই ছেলেমানুষ এখনও।

পর পর দুকাপ চা খেয়ে লম্বা একটা সিগারেট ধরাল সুমন্ত্র। দেবযানী ফুলদানিটা সরিয়ে একটা অ্যাশট্রে এনে রাখল সামনে। এবার স্নান করতে উঠবে সে। চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে রেখেছে সুমন। যেন চাইছে আরও কিছুক্ষণ বসে থাক এভাবে।

আর একবার ঘড়ির দিকে দেখল। কাল এতক্ষণ বাজার নিয়ে

চলে এসেছিল অনুপম। চিন্তা এসে পেঁছোনোর আগেই হুটহাট করে সব ফেলে পালিয়েছিল। একটুও দাঁড়াল না। বলেছিল, এক কাপ চা খেয়ে যাও অনুপ, এখনি করে দিচ্ছি। কিন্তু তবুও বসল না। এত তাড়া!

অথচ আজ এখনও দেখা নেই। কে জানে কোথায় ঘুরছে।

সুমন্ত্রকে বলল, এই তুমি অনুপমকে আজ খেতে বল আমাদের সঙ্গে।

—আমি কেন? তুমিই বল না।

—বলতে দিচ্ছেই না কোনও কথা। এসেই পালিয়ে যাচ্ছে।

—কেন বলতো? সুমন্ত্র হাসল, লজ্জা পাচ্ছে। ঠিক আছে বলে দেখব। কিন্তু রাজি হবে না মনে হয়, এখন।

—কেন?

—বোধ হয় আমাদের দুজনকে এখন একা থাকতে হবে বলে। ওরই তো প্ল্যান।

—যাঃ। তুমি বললে ঠিক শুনবে।

—না। একদিন বলেই দিয়েছে, এটা তোমাদের শুধু দুজনের সংসার সমুদা। এক্সক্লুসিভ হানিমুন ট্রিপ। আর কেউ মাথা গলাবে না।

লজ্জায় লাল মুখটা দেবযানীর, তাই! তুমি কি বললে?

বললাম, তবে ভাগ্ হতভাগা এখান থেকে—হা—হা। আসলে কচি ছেলে তো আর নয়। সব বোঝে। একটুও ডিসটার্ব করতে চায় না।

—ছিঃ এ সব তোমার কথা। ও মোটেই বলে নি।

—ঠিক আছে, এলে তুমি জিজ্ঞেস করে দেখো, বলেছে কি না।

—এ ম্মা! ছি! জিভ কেটে সুমনের চুলগুলো মুঠো করে টানে দেবযানী। টানতেই থাকে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে।

সমন্ত্র হাসে, হা—হা—করে।

পরক্ষণেই দুহাতে জাপটে আবার আদর করতে থাকে পাগলের মতো।

৬

সেই অনুপম!

মাথা উঁচু করে টান টান হয়ে হেঁটে আসছে এখন। বড় বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক যেন আজ। উচ্ছ্বল হাসির ভাবটা কোথায় চলে গেছে!

সেই সবুজ পুলওভারটা পরে এসেছে। বুকে ঢেউ খেলানো সাদা আর বেগুনি বর্ডার। রঙটা ঝলমল করে জ্বলছে রোদের মধ্যে। এত শীত কোথায় আজ! কিন্তু অনুপমকে মানিয়েছে খুব সুন্দর। অল্প বয়েসের উজ্জ্বলতায় চোখ টানে আরও।

সুমনের মতো ফর্সা তো নয়। তবু বেশ উজ্জ্বল তামাটে রঙ। সারাদিন রোদে পুড়ে পুড়েই আরও তামাটে। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া এলোমেলো চুল। কোনও খেয়াল নেই সেদিকে। বয়েসে প্রায় দশ বছরের ছোট ও সুমনের। অথচ লম্বায় চওড়ায় প্রায় সমান সমান এখন। হয়তো একটু বেশি ছিপছিপে। তাহলেও বেশ মানিয়ে গেছে।

কিন্তু মুখটাই যে বড় ম্লান আজ। হাসিখুশি ছেলেটা গম্ভীর আর মনমরা। এই চেহারাকেই যে ভয় দেবযানীর। এখনও ধক্ করে ওঠে বুকের মধ্যে।

মনে পড়ে যায় সেই ভয়ঙ্কর দিনটার কথা···

সেদিনও এমনি থমথমে মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল অনুপম। চোখ দুটো লাল। উসকো খুসকো চেহারা। শার্টের বোতামগুলো খোলা। পাগলের মতো অদ্ভুত চোখে তাকায় তার দিকে।

—ঝিনিদি···কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। কাঁপছে যেন।

—কী হয়েছে অনুপ? এমন দেখাচ্ছে কেন তোমায়?

—ঝিনিদি···বাগানের দিকে যেতে রাস্তায়···

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, রাস্তায়···দেবযানীর বুকের ভিতরটা যেন টলমল করে ওঠে, রাস্তায় কী হয়েছে?

—সমুদার বাইক আজ একটা লরিকে পাশ কাটাতে গিয়ে

হঠাৎ···হঠাৎ···

—মানে! অনুপম কী বলছ তুমি? ঠিক করে বলো ··

—মানে, একটা অ্যাকসিডেন্ট ঝিনিদি। দারুণ একটা অ্যাকসিডেন্ট···

—না, না!—সে কোথায় অনুপ?

—হাসপাতালে। মানে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই সমুদাকে হাসপাতালে···

কথাটা আটকে গেল এবার অনুপমের। চোখ মুখ ভরা উত্তেজনা।

দেবযানী টাল খেয়ে গেল হঠাৎ। পায়ের তলার মাটিটা তখন দুলছে। থরথর করে কাঁপছে তার শরীর। তবুও অনেক কষ্টে সামলে নিল নিজেকে।

—কোথায় লেগেছে তার অনুপ? কতটা লেগেছে?

—বলছি, মানে অবস্থা ভাল নয় ঝিনিদি। তোমাকে এখন ভেঙে পড়লে চলবে না, একটু শক্ত হও ঝিনিদি···প্লিজ···

বুক ভেঙে যাচ্ছে ভয়ে, উৎকণ্ঠায়। মাথার মধ্যে এক দুরন্ত ঘূর্ণি। আর ধৈর্য রাখতে পারে না দেবযানী।

—না—আ—। আর্তনাদ করে উঠল যেন হঠাৎ।

তারপর সম্বিত হারিয়ে কখন প্রাণপণে চড় মারে অনুপমের গালে। আর ঝরঝর করে কাঁদে, অনুপ আমায় ঠিক করে বলো! কী হয়েছে তোমার দাদার। আর লুকিও না আমার কাছে।

অনুপম জবাব দেয় না সহসা। শক্ত মুঠোর মধ্যে তার জামাটা প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। মুখটা রক্তে লাল। দেবযানীর পাথর বসানো ধারালো আংটিতে ঠোঁটের পাশটা ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরছে। টপ্ টপ্ করে দেবযানীর হাতেই পড়ল দু ফোঁটা।

সেই অবস্থাতেই বিকৃত সুরে বলল, ঝিনিদি, আমাদের সমুদা আর নেই। হাসপাতালে নিয়ে যেতে না যেতেই সব শেষ। বাঁচাতে পারলাম না ঝিনিদি···হা! আমার চোখের সামনেই···

দেবযানী শক্ত পাথর। আর কোনও কথা ফোটে না যেন। অদ্ভুত বোবার মতো তাকিয়ে থাকে অনুপমের রক্ত মাখা ঠোঁটের দিকে।

ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে সহসা। রক্তের ধারা গড়াল আবার।

—ঝিনিদি একবার মাসীমাকেও খবরটা···

—না—আ।···

চিৎকার করে ভাঙা আর্তনাদে অনুপমের বুকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে দেবযানী।

—না অনুপ, না। আমি কখনও পারব না। কিছুতেই পারব না।

আর বাধা মানে না চোখের জল। বুক ভরা কান্নার দমকে ফুলে ফুলে ওঠে শরীর। শক্ত হাতের মুঠোয় কান্না ভেজা জামাটা প্রায় ছিঁড়ে আসছে অনুপমের। তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে শান্তভাবে। প্রাণপণে সামলায় নিজেকে।

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত আর পারে না। হঠাৎ কখন সংযম হারিয়ে দেবযানীকে জড়িয়ে ধরে ছেলে মানুষের মতো হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

—এ কী হয়ে গেল ঝিনিদি, আমাদের···

তারপর ক্রমাগত শুধু কান্না। দুজনেই কাঁদতে থাকে দুজনকে ধরে। কেউ কোনও সান্ত্বনার কথা বলে না আর।

কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল যেন এক নিমেষে! ঈশ্বর কি তার কপালে এই লিখেছিলেন! কিন্তু কেন, কেন?

কিছুতেই যেন ভাবা যায় না। আজও ভাবতে পারে না। সুমন্ত্র আর নেই। আর আসবে না কখনও।

সব শোকই একটু একটু করে সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে যায় মানুষের। তীব্রতা হারিয়ে ফেলে তার নিজস্ব নিয়মে। কিন্তু সুমনের শোক তো গেল না! এখনও চাপ ধরে বসে আছে তার চারদিকে। প্রতিটি দিন রাত্রির নির্জন মুহূর্তে।

চোখের জল শুকিয়ে গেলেও ভিতরে থমথমে এক চাপ ধরা অনুভূতি। তার ভারেই আচ্ছন্ন দেবযানী। কোনও দিকেই আর তেমন খেয়াল নেই।

তবু সেদিন অনুপমই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। এক মুহূর্তে যেন বড়ো হয়ে ওঠে সে। শেষ যাত্রার উদ্যোগ নেয় সবাইকে জড়ো করে। ফুলমালা, চন্দন দিয়ে তার সমুদাকে নিজের হাতে সাজায়।

শোকার্ত পরিবারের সব দায় দায়িত্বের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে হঠাৎ এক লাফে যেন একজন অভিজ্ঞ মানুষ হয়ে গেল অনুপম।

অরুন্ধতীদেবীকে নিয়েই নাজেহাল হতে হয় আরও। একমাত্র ছেলে তাঁর, জোয়ান বয়েস। নতুন বিয়ে হয়েছে। খবরটা পেয়েই আছড়ে পড়লেন মাটিতে। এ কী হল তাঁর! ক্রমাগত ছটফট করেন, আর কাঁদেন বুক ফাটা এক আর্তনাদে। কেউ নেই সান্ত্বনা দেবার। সান্ত্বনা হয় না যে শোকের।

মৃতদেহ বাড়িতে পেঁাছলে অবসন্ন দেহে একবার উঠলেন। কে যেন ধরে ধরে বাইরে নিয়ে এল তাঁকে। কিন্তু দৃশ্যটা সহ্য করতে পারেন না। বীভৎস ভয়ঙ্কর একটা চেহারা সমুর…

বুক ভাঙা আর্তনাদে আবার ডুকরে উঠলেন, বউমা—ও বউমা এ কী হয়ে গেল মা! এ কী হল আমাদের…

বলতে বলতেই দেবযানীকে জড়িয়ে ধরেই কাঁপতে কাঁপতে সংজ্ঞা হারালেন। পুরো অচৈতন্য।

একপাশে শুইয়ে জলের ঝাপটা দেওয়া হতে থাকে চোখে মুখে। ক্ষমাদি এসে স্মেলিং সল্টের শিশি ধরে নাকের কাছে। আস্তে আস্তে চৈতন্য ফিরল একসময়। কিন্তু চারদিক দেখে পরক্ষণেই আবার ফিট হয়ে পড়লেন। চোখের সামনে দেবযানীর পাথরের মতো মূর্তিটা দেখেই যেন আর সামলাতে পারেন না নিজেকে।

সব্বাই মিলে তাকেই ঘিরে থাকে। তবু স্বাভাবিক হতে পারেন না।

শেষে ডাক্তার ডাকতে হল অনুপমকে।

খবর পেয়ে কর্নেল সাহেবও চলে এসেছিলেন দ্রুত। সঙ্গে ফুলের পাহাড় এক গাড়ি। ঘন ঘন রুমালে চোখ চাপা দিচ্ছিলেন। কখনও চোখে জল দেখা যায় না যাঁর, তিনিও আর সামলাতে পারছিলেন না যেন নিজেকে।

এসে চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। দেবযানীকে বুকে চেপে ধরলেন একবার। নিঃশব্দে চোখের জল পড়ে ঝরঝর করে। কোন কথা নয়। অনেক করেও কোনও সান্ত্বনার কথা আসে না মুখে।

এইটুকু বেলা থেকেই তাঁর মা-হারা মেয়েটাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। কোনও ইচ্ছেই অপূর্ণ রাখেন নি কখনও। কাছ ছাড়াও করতে চান নি বহুদিন। মনীষার কথা মনে হয়েছে বারবার। সেই তার মুখের আদলটা নিয়েই দেবী একটু একটু করে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর চোখের সামনে।

তখন কত চাপ এসেছিল চারদিক থেকে। আবার বিয়ে করো, বোস। কাম অন বোস, য়ু কান্ট গো অন লাইক দিস। পুরনো কথা ভুলে যাও। ট্রাই টু বি প্র্যাকটিকাল। অ্যান্ড হোয়াই নট। সুষমা তোমাকে সত্যি ভালবাসে। অস্বীকার করতে পার—ক্যান য়ু?

...সো সেন্ড ইয়োর কিড টু সাম হোস্টেল, অ্যান্ড ম্যারি এগেইন। এখনও অনেকদিন পড়ে আছে সামনে। জীবনটা নতুন করে শুরু করো আবার।

...অ্যান্ড ট্রাই টু বি হ্যাপি। এতে কোনও অন্যায় নেই।

ক্যাপটেন দাস, ক্যাপটেন খান্না, লেফটেন্যান্ট চৌধুরী সবার মুখেই এক কথা—বিয়ে করো বোস, আবার বিয়ে করে নতুনভাবে জীবন শুরু করো। আ ন্যু ম্যারেড লাইফ ফর বোথ অফ য়ু।

সুষমা ভার্গিসের সঙ্গে তাঁর নতুন সম্পর্কের কথা আর কারও অজানা নেই তখন। ইউনিটের যে কোন ফাংশানে, ক্লাবে, পার্টিতে প্রায়ই চোখে পড়ছে। মেজর ভার্গিসেরও প্রচ্ছন্ন সায় ছিল ব্যাপারটায়। মেয়েকে হয়তো তিনিও বাধা দিতেন না এ বিয়েতে।

কিন্তু না, তা আর হয়ে উঠল না। দেবযানীর মুখের দিকে তাকালেই যে চমক লাগত। মনীষাকে মনে পড়ত বারবার। তাঁকে ছেড়ে গিয়েও যেন কাছাকাছি রয়ে গেছে সে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি!

পরে আরও একটু বড় হয়ে যখন শাড়ি ধরল দেবী, তখন যেন সে এক কিশোরী মনীষা। ঘাড় ঘুরিয়ে হাসত যখন তার দিকে

চেয়ে, বুকের মধ্যে ধক করে উঠত সহসা। একেবারে সেই মুখ, সেই হাসি, সেই ভ্রূ যুগল, চোখের গভীরে চাপা ছেলেমানুষী রহস্যের আভা।...

সব হিসেব ওলটপালট হয়ে যায়। একে কী করে কাছ ছাড়া করবেন তিনি! তা হয় না, তা হয় না...

আরও কত ছোট ছোট ঘটনা জীবনের। চোখের সামনে ঝড়ের মতো ঘুরপাক খায়। কিন্তু মুখে কোনও কথা নয়। মেয়েকে বুকে নিয়ে এই মুহূর্তে সমস্ত হাহাকার চাপা দিয়ে রাখেন কর্নেল। ঘন ঘন শুধু নিঃশ্বাস পড়ে নিঃশব্দে।

পিতা পুত্রী দুজনে যেন দুজনের দুঃখ আর শূন্যতা এইভাবে ভাগ করে নিতে থাকেন স্তব্ধ হয়ে। অদ্ভুত দৃশ্য!

একটু পরে বড় জ্যাঠামশাই এলেন ভবানীপুর থেকে। সঙ্গে জেঠিমা। দুজনেই কাঁদছেন ঝরঝর করে। জ্যেঠিমাকে তার মধ্যেও সামলাতে চেষ্টা করছেন শরদিন্দু জ্যাঠা। কিন্তু সুমন্ত্রের ছিন্নভিন্ন বিকৃত শরীরটা দেখে তিনিও আর সামলাতে পারেন না। হায় ঈশ্বর, এ কী হল? এ কী হল?

বলতে বলতে শরীরটা দুলে উঠল। মাথাটা ঘুরে অজ্ঞান হবার জোগাড় প্রায়। সদ্য স্ট্রোক থেকে উঠেছেন।

অনুপম তাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে যায় সেখান থেকে।

বিরাম নেই লোকের আনাগোনার। কত দূর দূর থেকে কারা সব আসে। সবার হাতেই ফুল, ফুলের মালা। সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে তার। সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে।

প্রায় সবাই অচেনা দেবযানীর। তবু এই মুহূর্তে যেন খুব কাছের বলে মনে হয়। আত্মীয়, অনাত্মীয়, সুমন্ত্রের অফিসের লোকজন। অনুপম জানে ঠিকমতো। সেই সামলায় সবাইকে।

গুরুদুয়ারায় খবর দেওয়া হয়েছিল। গাড়িটা এসে পড়ল সময়মতো। কাচঘেরা কালো রঙের শববাহী গাড়ি। মৃত্যুর মতো শীতল আর শব্দহীন। চুপচাপ অপেক্ষা করে পাতাবাহার ঝোপের আড়ালে।

আর দেরি নয়। অনুপম দ্রুত তোড়জোড় শুরু করে দেয়। চেনা অচেনা একদল মানুষ তার সঙ্গে। সবাই যোগ দেবে সেই শেষ যাত্রায়।

অনুপম ধীরে ধীরে দেবযানীর কাছে এল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে একটুক্ষণ।

বলল, ঝিনিদি এবার ওঠো।

—কোথায় অনুপ?

—একবার বাইরে এসো দাঁড়াও।

—না। আমি পারব না অনুপ।

—তা হয় না ঝিনিদি। তোমাকে একবার আসতে হয়।

ক্ষমাদি এগিয়ে এল পাশ থেকে। বলল, আমি নিয়ে যাচ্ছি। তুই যা অনুপ। চন্দন বেঁটে রেখে এসেছি। সুকুমারীকে বল, পরিয়ে দেবে।

তারপর কাছে এসে দেবযানীর পিঠে হাত রাখে। নিঃশব্দে হাত বোলাতে থাকে কিছুক্ষণ। বলল, বউ একবার শেষ দেখাটা দেখবে না!

বলতে বলতেই কাঁদে, এ যে একেবারে জন্মের শোধ দেখা। আমারও যে কপাল ভেঙেছিল একদিন এমনি করে। আমি এখনও ভুলিনি বউ···সব সহ্য করেছি। করতে হয় বেঁচে থাকতে গেলে··· আমি আর কী বলব তোমায়···শুধু আত্মার শান্তি কামনা করো ওর, পায়ের কাছে গিয়ে বোসো একটু। তারপর তো দেখতে দেখতেই খেলা ফুরিয়ে যাবে সব—আহ্ হা। মাগো—

ক্ষমাদির একটানা বিলাপ চলতে থাকে সমানে।

তবু দেবযানী ওঠে না। উঠতে পারে না। অনড় হয়ে এক-ভাবে বসে থাকে ঘরের মধ্যে। পাথরের মতো অটল মূর্তি। উদাসীন আর গম্ভীর দৃষ্টি। ক্ষমাদির কান্নার মধ্যেও একইরকম অবিচল। আর ধ্যানমগ্ন।

আরও কে একজন এসে দাঁড়াল তার সামনে। দেবযানী লক্ষ করে না। ঝাপসা অনেকগুলো মুখ ঘুরছে এখন চারপাশে। তাদের চাপা ফিসফাস কথা। কান্নার শব্দ। আবার কে এল যেন কাছে সান্ত্বনা দিতে।

—কী করবে মা। মানুষের তো কোনও হাত নেই এতে। মনকে শক্ত করো মা। তোমার কর্তব্য তুমি করে যাও…

দেবী দেখেও দেখে না তার দিকে। কানেও নেয় না কোনও কথা। সমস্ত শরীর যেন অসাড় আর বিবশ তার। মন জুড়ে শুধু সুমনের স্মৃতি। পাথরের মতো গাথা হয়ে আছে। বাইরের কোনও কিছুই আর স্পর্শ করে না তাকে।

বালিগঞ্জের পিসিমাও চেষ্টা করলেন অনেক। অন্তত কিছু বলুক দেবযানী। কাঁদুক একবার। বুক ভাসিয়ে কাঁদুক। এই থমথমে মূর্তিটা যেন ভাল নয়। বিপদ ঘটে যেতে পারে কোনও।

— অ বউমা, একবার দ্যাখো আমার দিকে। আমি সব বুঝি মা—সব বুঝি।

দেবযানী ফ্যালফেলে অবাক চোখে তাকায়। পলক পড়ে না কোনও।

—এই তো মানুষের জীবন!

পাথরের মূর্তিটা তেমনি তাকিয়ে থাকে।

—আজ আছে কাল নেই। যে যায়, সে বুক ফুলিয়ে চলে যায়। যে থাকে সেই কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়!

কিন্তু পাথরের মূর্তিটা কাঁদে না।

—তবু কাঁদতে কাঁদতেও আবার বুক বাঁধতে হয় মা। উঠে দাঁড়াতে হয়। তাই-ই যে এ সংসারের নিয়ম। যতদিন জীবন ততদিন শুধু কর্তব্য করে যাওয়া…দায় চুকিয়ে যাওয়া সংসারের…

দেবযানীর চোখে এক ফোঁটাও জল আসে না।

পিসিমাই শুধু কাঁদছেন তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে। আপন মনে যেন নিজের কথাই বলে চলেছেন। যাকে বলছেন, তার কোনও ভাবান্তর নেই। চোখে জল নেই—

সে এখনও তেমনি কঠিন হয়ে দেখছে তাঁকে। অদ্ভুত শূন্য সেই দৃষ্টির সামনে যেন কেমন বিব্রত বোধ করেন পিসিমা। অবাক চোখে খানিক দেখতে দেখতে উঠে পড়েন অবশেষে। নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে বাগানের দিকেই চলে গেলেন।

বাইরে ভিড়টা বাড়ছে ক্রমশ। অনেক মানুষের কোলাহল।

বিবরণটা শোনাচ্ছে একজন অ্যাকসিডেন্টের এখনও। দেবযানীর খোঁজ চলছে।

—মিসেস কোথায়, মিসেস ? একবার দেখা করা যায় না ?

—এই তুলি, মুখটা আড়াল করিস নে ! সরে যা—

—ফুলের তোড়াটাও সরিয়ে দে, হ্যাঁ, আর একটু।

—নিন চটপট তুলে ফেলুন ছবিটা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি বসে পড়ুন ম্যাডাম।

পর পর ছবি উঠতে থাকে। তার সোরগোল।

কেউ না দেখিয়ে দিলেও দেবযানী দেখতে পাচ্ছে সব।

ফুল মালার পাহাড় দিয়ে সাজানো শবদেহ। কোণে কোণে ধূপকাঠি। ধূপের গন্ধ উড়ছে হাওয়ায়। ফুলের গন্ধ। অগুরুর গন্ধ…দুখিয়াবাবার জল সমাধির কথা মনে পড়ে হঠাৎ। মনে পড়ে তাদের সেই প্রথম একসঙ্গে বাইরে বেরোনোর দিনটা। একসঙ্গেই বসে দেখেছিল দুজনে। সুমন পছন্দ করেনি ব্যাপারটা। তবু দেখেছিল একমনে…বেলা ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের চোখের সামনেই জলে ডুবিয়ে দেওয়া হল বাবাকে…চারদিকে সমবেত সঙ্গীত, নামকীর্তন, বাবার নামের জয়ধ্বনি…এতদিন পর এই মুহূর্তে হঠাৎ যেন মনে পড়ে যাচ্ছে। কেন জানে না দেবী, জানে না…

—বল হরি—হরি বোল—

—হরি বোল !

মৃদু হরিধ্বনির গুঞ্জন। অনুপের গলা পাওয়া গেল যেন।

গাড়িতে তোলা হচ্ছে শবদেহ। সমুদাকে শেষবারের মতো প্রণাম করে নিচ্ছে অনুপ। চাপা কান্নার শব্দ। ডুকরে ডুকরে সুর করে কান্না। অরুন্ধতী দেবী কি উঠে এলেন আবার ?

আবার ধ্বনিটা উঠল। এবার আরও জোরে—

বল হরি—হরি বোল—

বুকের মধ্যে সহসা যেন প্রবল ধাক্কা লাগে দেবীর। গুঞ্জনটা গুরগুর করে কাঁপছে। তার সারা শরীর জুড়ে কাঁপছে। লাল বিকেলের সেই শান্ত নদীর মধ্যে কারা যেন সুমনকে নিয়ে যাচ্ছে। আবির ছড়ানো জলে টলমল করা ঢেউ…

—একবার ওঠো তুমি, ঝিনিদি।

অনুপ এসে কখন হাত ধরেছে তার। টানছে তাকে, এসো—তুমি বিদায় দাও সমুদাকে। না হলে আমরা যেতে পারি না।

গলাটা ভাঙা অনুপমের। চোখ দুটো লাল। তার মধ্যেও মিনতি করছে হাত ধরে।

আচ্ছন্নের মতো দেবী চোখ তুলে তাকায় একবার। কালসিটে পড়ে গেছে গালে। ঠোঁটের পাশে এখনও জমাট রক্তের দাগ। সেই এসে দুহাতে টানছে তাকে।

এসো ঝিনিদি, এসো একবার। তাকিয়ে দেখ আমরা কেমন সাজিয়েছি সমুদাকে···

ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে দেবযানীর। যেন একটা কথাই সে বলতে চায় বারবার।

···না আমি পারব না। কিছুতেই পারব না তোমাদের কথা রাখতে। ওই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিকৃত শবদেহটাকে আর দেখতে চাই না। আমার সুমন ওখানে নেই। শান্ত বিকেলের নদী তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখন। আমি মনে মনে তাকেই দেখছি··· দেখতে পাচ্ছি···

অনুপ আবার বলে, তুমি নিজের হাতে মালাটা পরিয়ে দাও।

—মালা? অবাক হয়ে তাকাল দেবী।

—হ্যাঁ ঝিনিদি। বড়ো মালা রেখেছি একটা। না হলে সমুদা শান্তি পাবে না। দিতে হয়—এসো ঝিনিদি, আর দেরি করো না।

চোখের সামনে আবার নদীটা টলমল করে। তার মধ্যে শায়িত শান্ত সুমনের মুখ। ফুলের মালা আর চন্দন....

গলাটা যেন বুজে আসছে অনুপমের, সমুদা তো কখনও অসুখী ছিল না। এই শেষ যাত্রাটাও তার সুখের হোক....উঠো ঝিনিদি। মালাটা পরিয়ে তুমি নিজের হাতে বিদায় দাও তাকে।

কে যেন বললেন পাশ থেকে, বউমার তো সঙ্গেই যাওয়া উচিত। শেষ কাজটা দাঁড়িয়ে থেকে আর কে করবে।

—না না, সে কি! আপনি চুপ করুন তো।

—যত্তো সব আজগুবি আইন আপনাদের। হিস্ হিসে গলায়

অন্য আর এক জন ফুঁসে উঠছে নিজের মনে ।

দেবযানী তবুও অনড় । কোনও রকম শক্তি নেই যেন শরীরে । কী করে পা বাড়াবে সে ।

অনুপম শেষ পর্যন্ত তাকে জোর করেই তুলে নেয় । তারপর দু-হাতে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় বাইরের দিকে ।

৭

সুমন চলে গেল ! আর আসবে না কোনও দিন ।

পরপর কদিন এছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না দেবযানী । অবসন্ন দেহমন ভারাক্রান্ত এই একটাই অনুভূতিতে । রাতের পর রাত ঘুম আসে না চোখে । কথা বলতেও ইচ্ছে হয় না কারও সঙ্গে । চুপচাপ নিজের চারদিকে একটা অবরোধ তৈরি করে নিয়ে তার মধ্যেই আত্মগোপন করে থাকে ।

আর বসে বসে ভাবে । এই ভাবেই যেন বোঝাপড়া করবে নিজের সঙ্গে ।

চোখ বুজলে দেখতে পায় সেই দিনগুলোর ছবি । যেন স্পষ্ট দেখতে পায় । হাসি, হুল্লোড়, মজা আর আনন্দের ছবি । পরপর গাঁথা হয়ে আছে মনের ভিতর । অথচ এখন কী ভয়ঙ্কর শূন্যতা সর্বদিকে । সারা ঘরবাড়ি জুড়ে ।

কোথায় মিলিয়ে গেল সেই গমগমে দরাজ হাসি । দেবযানী কান পেতে থাকে । যদি কখনও হঠাৎ বেজে ওঠে সেই ধ্বনি । চমকে দূরের দিকে তাকায় । হা—হা হাওয়ার শব্দ ।

না, সেই ধ্বনি আর উঠবে না । সুমন আর নেই !

ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে ভাবে । চারিদিকেই তার ব্যবহৃত আসবাব । খাট, বিছানা, আলমারি, পোষাক-আসাক । যে দিকে তাকাও শুধু তার চিহ্ন । দেখতে দেখতে কখন হঠাৎ জল এসে যায় চোখে । একলা বসে কাঁদে । প্রাণভরে নিঃশব্দে কাঁদে সবার চোখের আড়ালে ।

কাঁদতে কাঁদতেই আবার সামলে নেয় নিজেকে । মনে হয়, সে বুঝি হাল্কা হয়ে যাচ্ছে তার দুঃখের ভার থেকে । তার সুমন কি এমনি করেই একটু একটু করে দূরে সরে যাবে ? ফিকে হয়ে যাবে ।

অনেক দূরের এক স্মৃতির মতো ?

না, সে কিছুতেই তা হতে দেবে না। চোখের জল মুছে ফেলে দেবযানী।

নিঃশ্বাস চেপে সুমন্ত্রর ছবির দিকে চোখ তুলে তাকায়। একভাবে তাকিয়ে থাকে কতক্ষণ। ছবিটা যেন দুলছে। সেই কৌতুক ভরা উজ্জ্বল দৃষ্টি। কোনও দুঃখের ছোঁয়া নেই। যেন বলছে মাথা নেড়ে দেবী, এই দেবী। ছিঃ, তোমায় মানায় না এটা। আমি তোমার কাছেই তো আছি। থাকব বরাবর। এই দেবী...

ঝিরঝির করে হাওয়া দেয় বাইরে। তার শব্দের মধ্যেই যেন কথাগুলো ঘুরপাক খায় গোটা বাগান জুড়ে। আর দেবযানী আত্মবিস্মৃত হয়ে ডুবে যেতে থাকে সেই শব্দের গভীরে

নীচের ঘর থেকে চাপা শোরগোল ভেসে আসছে। কীসের ঠিক বুঝতে পারে না। উত্তেজিত কথা কাটাকাটি চলছে যেন কাদের সঙ্গে। পল ডেকে উঠল একবার ঘেউ ঘেউ করে।

অনুপমের গলা এবার, আমি বলছি, না। তা হতে পারে না।

—কেন পারে না।

—কক্ষনো না। আপনারা চলে যান এখান থেকে, প্লিজ—

—আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি। ওনার কথাটা অনার করবেন না ? কি লোক মাইরি আপনারা।

বিশ্রী কথা বলার ধরন লোকটার। তেমনি হেঁড়ে গলা।

দেবযানী ভেবে পায় না কোথা থেকে সকালবেলায় এমন একটা লোক এসে জুটল। সঙ্গে আরও কারা কথা বলছে যেন। ওরা কী চায় এখানে ? এমন অযাচিত ভাবে কেন এবাড়িতে এসে চড়াও হয়েছে ?

খুব কষ্ট হয় দেবযানীর। এ বাড়ির শান্ত স্তব্ধ পরিবেশটাকে হঠাৎ ঘুলিয়ে তুলছে ওরা। ক্রমাগত অভব্য আর অরুচিকর চিৎকার, চেঁচামেচি। অথচ কিছুই বুঝতে পারে না সে। ভীষণ খারাপ লাগে সবকিছু। কেন এসেছে ওরা ?

আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে উঠে পড়ল সে। নিজের চোখেই দেখবে ব্যাপারটা। অনুপম আবার কী বলছে উত্তেজিত হয়ে। সব কথা

স্পষ্ট নয়। অন্য রকম গলার স্বর তার। খুবেই অদ্ভুত লাগে যেন।

পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে দেবযানী।

বাইরের ঘরের দরজাটা পুরো ভেজানো নয়, আধখোলা। ভিতরে দেখা যাচ্ছে লোকগুলোকে। চুপচাপ দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। দারুণ কৌতূহলে আর উৎকণ্ঠায় ঢিব্‌ঢিব্‌ করতে থাকে বুক।

তিনজনই অপরিচিত। এক পাশে অরুন্ধতী দেবী, এক পাশে অনুপম। আর সামনে ওরা তিনজন। কী মতলব, বোঝা যায় না।

অরুন্ধতী দেবীর চোখ দুটো ফোলা ফোলা। কাঁদছিলেন হয়তো একটু আগেই। এখন চুপচাপ। মাথায় ঘোমটা তুলে ওদের কথা শুনছেন।

অনুপমের চোখ মুখ লাল। দারুণ রেগে আছে যেন।

তার সামনেই মোটা গোঁফঅলা গাট্টাগোট্টা লোকটা। চুপচাপ তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। কেমন গুন্ডা গুন্ডা দেখতে।

পাশের জনও তেমনি চেহারার। লম্বাটে ট্যাঙা, এক মুখ ভর্তি ব্রণ। ড্যাবড্যাব করে চোখ ঘুরিয়ে দেখছে ঘরের অন্ধি-সন্ধি। দরজার এক চিলতে ফাঁক দিয়ে ভিতরটাও যেন দেখে নিতে চায়। খুবই খারাপ নজর লোকটার।

দেবযানী একপাশে সরে যায়। সরে গিয়েও আড়াল থেকে দেখতে থাকে তৃতীয় আর একজনকে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা মধ্যবয়েসী লোকটাকে। একটা নেতা নেতা ভাব চোখে মুখে। এদেরই লিডার হয়তো। কুচকুচে কালো মুখের ওপর কালো ফ্রেমের চশমা। অদ্ভুত লাগছে, দৃষ্টিটা। কথা বলতে বলতে চশমাটা তাঁর নাকের ডগায় নেমে এসেছে। সেই ফাঁক দিয়েই দেখছেন।

আর হাত মুখ নেড়ে অরুন্ধতী দেবীকে কী বোঝাচ্ছেন নীচু গলায়, না মা, এক্ষুণি কোনও দরকার নেই। আর কয়েকটা দিন দেরি হলেই বা এমন কি? ভাল করে ভেবে দেখুন একবার ব্যাপারটা, তারপর না হয়....

বলতে বলতে থেমে যায় লোকটা। চশমার ফোকর থেকে চোখ দুটো পিট পিট করে অরুন্ধতী দেবীর দিকে।

দেবযানী অবাক! কিছুই ধরতে পারে না সে।

কারা এরা? কী এমন আলোচনা এদের সঙ্গে? কোন্ ব্যাপারটা ভেবে দেখতে বলছে মাকে? এদের আগে কখনও দেখেছে বলে তো মনে করতে পারে না। তাদের এমন দুঃখের দিনে কোথা থেকে এসে হাজির হল এই বিদঘুটে লোকগুলো। কী অধিকারে বিরক্ত করছে তাদের?

কিছুই ভেবে পায় না সে। তবু দাঁড়িয়ে থাকে একভাবে। খারাপ লাগছিল খুবই। মনে হচ্ছিল, তার চারপাশের শোকস্তব্ধ নীরব মুহূর্তগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে এই অবাঞ্ছিত লোক-গুলোর উপস্থিতিতে....

অনুপম গম্ভীর গলায় বলে উঠল, এ সব কথা এখন বলবেন না। আপনারা বরং এবার আসুন—। বুঝতেই তো পারছেন, আমাদের সবার মনের অবস্থা—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। চশমার ফোকর থেকে তাকিয়ে লিডার মাথা ঝাঁকালেন, তা আর বলতে।

—কিন্তু আমাকে যে সেদিন নিজের মুখে ওয়ার্ড দিল সেন-বাবু। সেটার কী হবে? একটা ফয়সালা করুন আপনারা—

মুখের ব্রণ টিপতে টিপতে ঢ্যাঙা ছেলেটা বলে উঠল। অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে গলার স্বর।

অনুপম আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কাঁপছে রাগে।

বলল, এসব আজে বাজে কথা একদম বলবে না। কেউ বিশ্বাস করবে না এখন—

—আজে বাজে কথা? সেনবাবু নিজে আমায় ওয়ার্ড দিল। মাইরি! উনি বলছেন বাজে কথা।

—কোথায় হল, আপনার সঙ্গে কথাটা সমুদার? টেলিফোনে?

—কেন খড়দায়! আমাদের গেরেজেই হল। এই তো নিম্মলদার কারখানার পাশে। সেখানেই চাকায় হাওয়া দিতে দিতে তিনি বললেন।

—তখন সমুদা আপনাকে হঠাৎ বলল?

—হ্যাঁ।

—কী বলল? এসো ভাই, তুমি আমার বাগানে এসো।

—তা কেন? বলল, পোল্ট্রি করতে দশ কাঠা জায়গা দেবে বাগানে—পরে দাঁড়িয়ে গেলে আরও···

—অসম্ভব ভাই। সমুদা আপনাকে বলল আর আমরা কেউ কিছু জানলাম না, তা হতে পারে না। অ্যাবসার্ড!

—মাইরি বলছি দাদা, এই নিম্মলদার সামনেই কথা হল। ল্যাণ্ড সেনবাবুর, মাল ইনভেস্ট আমার। শেয়ার ফিফটি ফিফটি। বিশ্বেস না হয় জিজ্ঞেস করে দেখুন নিম্মলদাকে—

হাত তুলে সে ধুতি পাঞ্জাবি পরা লিডার নির্মলবাবুকে দেখায়।

অনুপম দৃঢ়স্বরে বলে, না ভাই কোনও দরকার নেই। আমি জানি সমুদা আপনাকে বলেনি। কী লাভ কথা বাড়িয়ে।

—কী আশ্চর্য!

—বললে আমি অন্তত নিশ্চয়ই জানতাম। এখন এসব বলে আর মিথ্যে সময় নষ্ট করবেন না। আমাদের মন-মেজাজ ভাল নেই। দয়া করে এখন চলে যান আপনারা—

—তার মানে? লোকটা মরে গেল বলে তার জবানের কোনও দাম দেবেন না, আপনারা?

লিডার নির্মলবাবু এবার একটা চাপা ধমক দিলেন ছেলেটাকে।

—এই তোচন, কী হচ্ছেটা কী? আস্তে কথা বল। মাসীমা বসে রয়েছেন সামনে। এমন একটা শোক পেলেন এই বয়েসে, আর তুই মেজাজ গরম করছিস? ছি ছি—

—আমি যা ট্রু ফ্যাক্ট তাই বলে দিলাম। ওনারা তো জানেন না কথাটা। সেনবাবু ইজ্জতদার আদমি ছিলেন। তিনি থাকলে কী আর বলতে হত কিছু।

—আরে কী আশ্চর্য কাণ্ড! বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প বলবেন আপনি, আর তাই মেনে নিতে হবে আমাদের?

—আমি ফালতু বাত বলছি?

—নিশ্চয়ই বলছেন।

—এই মশাই, আপনি তখন স্পটে ছিলেন?

—আঃ তোচন, আবার?

নির্মলবাবু চোখ পাকালেন ছেলেটার দিকে ফের।

পরে ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি এনে বললেন, কিছু মনে

করবেন না ভাই। ছেলেটার মেজাজটাই ওইরকম। এখন কী মাথা গরম করার সময়। দেখুন দেখি—।

অনুপম কোনও উত্তর দেয় না কথার। রাগে ফুঁসছে মনে মনে।

নির্মলবাবু হাসি হাসি মুখে আবার বললেন, তবে কথাটা হয়-তো একেবারে মিথ্যে নয়। সেনবাবুকে সেদিন আমি দেখেছিলাম তোচনের দাদার গ্যারেজে। গাড়ির কাজ করাচ্ছিলেন—এই তো ধরুন, অ্যাকসিডেন্টের চার-পাঁচদিন, কি এক হপ্তা আগে।

—তাতে কী প্রমাণ হয়? গাড়ির কাজ করাতে গিয়ে সমুদা বলল, তোমাকে জায়গা দেব আমার বাগানে। আমায় বিশ্বাস করতে হবে এই আজগুবি কথা?

—কথাটা ওভাবে নিচ্ছেন কেন? তোচন নিশ্চয়ই বলেছিল কিছু সেরকম। ও অঞ্চলের সবাই মানতো তো তাঁকে। কত বড় একটা ফার্মের মালিক, ইঞ্জিনিয়ার—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। আমি একটা চাকরির জন্যে ধরতেই, উনি বললেন চাকরি কেন করবে? এই ব্যবসাই তো ভাল।

আমি বললুম, না স্যার এতে সুবিধে হচ্ছে না।

সেনবাবু তখন একটু ভেবে নিজেই আমাকে পোল্ট্রি করার প্ল্যানটা দিলেন।

আমিও পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, ঠিক আছে স্যার। আপনার ঠিকানাটা দিন, বাড়িতে গিয়ে দেখা করব।

—বাঃ বেশ চমৎকার গল্প বানাতে পারেন দেখছি। আর সমুদা আপনাকে বাড়িতে চলে আসতে বলল?

—আপনি মহা টেঁটিয়া পার্টি তো মশাই। বলছি সেনবাবু আমায়...

—এই দেখো, আবার এইসব কথা। ঠিক আছে, ঠিক আছে এখন আর নয়। পরে হবে—

নির্মলবাবু হাত তুলে থামিয়ে দিলেন ছেলেটাকে।

পরে নরম গলায় বললেন, যিনি বলেছিলেন তিনি তো আর নেই। খামোকা মাথা গরম করে কী লাভ। এখন এরা যা বলবেন তাই শুনতে হবে তোকে। মুখের কথা নিয়ে তো কোর্ট কাছারি

চলে না।

তোচন একটা জবাব দিতে গিয়েও দেয় না। ঘাড় হেঁট করে থাকে এবার।

পাশের গোঁফঅলা ছেলেটা তেমনি চুপচাপ। একটা ঠাণ্ডা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে অনুপমের মুখের দিকে। যেন এভাবেই একটা চাপ সৃষ্টি করতে চায় সে।

অবস্থা বুঝে লিডার নির্মলবাবুও সুর পাল্টালেন।

নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কপাল! সবই কপাল মানুষের। না হলে কে কল্পনা করতে পেরেছিল এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাবে। একেবারে ইন্দ্রপতন যাকে বলে। আহা! এখন আর কী লাভ এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করে।

আবার গভীর নিঃশ্বাস পড়ে ভদ্রলোকের। যেন পাকা অভিনেতা একজন। চোখ ঘুরিয়ে অরুন্ধতীদেবীর মুখের দিকে দেখলেন একটু।

পরে গলাটা খাদে নামিয়ে বললেন, আসলে সময়! এর ওপর কারও হাত নেই। সময় আর কপাল! আবার সময় হলে, কপালে যদি থাকে, তাহলে তোরও ব্যাবসাটা একদিন হয়ে যাবে, দেখিস! কী বলেন আপনি মা?

বলতে বলতে অনুগতের মতো তাকিয়ে থাকেন নির্মলবাবু।

অরুন্ধতীদেবী বললেন, আমি কিছু বলতে পারি না, বাবা।

—সে তো বটেই। এখন কী করে বলবেন। তবু আপনাকেই তো দেখতে হবে সব দিক। এখন এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কী করে। সবাই যে আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে।

—না বাবা। আমি কোনও কথাই বলতে পারি না। এই জমি, বাগান সবই ছিল তার প্রাণ···এর একটুও আমি···

বলতে বলতে আঁচলে চোখ চাপা দিলেন। কাঁদছেন নিঃশব্দে।

—না মা, আর চোখের জল ফেলবেন না আপনি। সে তো আমরা শুনেছি। ইঞ্জিনিয়ার মানুষ হয়েও চাষার মতো যে ভাবে ক্ষেত-খামার নিয়ে ডুবে থাকতেন, আজকের দিনে কল্পনাই করা যায় না। দেবতুল্য চরিত্র ছিলেন একজন। আহা! কত বড় মাপের মানুষ···

—থাক বাবা। ওসব কথা এখন থাক। আঁচলে চোখের জল মুছে নিলেন মা। গলার স্বরটাও দৃঢ় এবার, ওর জমিজমা যা যেখানে ছিল, সব তেমনি থাকবে।

—হ্যাঁ মা, সে তো একশবার! আপনার ওপর আর কার কথা। তবে বলছিলাম, দেখাশোনার অভাবে যে নষ্ট হয়ে যাবে। এত বড় একটা সম্পত্তি···

—সেটা যাদের জিনিস তারাই ভাল বুঝবে। বউমা আছেন, অনুপম আছে। ওদেরও তো প্রাণ পড়ে আছে ওখানে···

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তার ওপর আর কোনও কথা ওঠে না। বউমা যদি নিজে দেখাশোনা করতে পারেন, খুবই ভাল কথা।

—হয়তো তাই করবেন এবার।

—কিন্তু বউমা মেয়েছেলে মানুষ। তিনি কি পারবেন সব দিক রক্ষে করতে।

—না পারলে দেবে বিক্রিবাটা করে। তার জিনিস সে যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমার কিছু বলার নেই।

—আমিও তাই বলছিলাম, মা। যদি বিক্রি করেন আমাদের কথাটা একটু ভেবে দেখবেন। আমি যা ন্যায্য দাম হয়, তাই-ই দেব। ঠকাব না আপনাদের। আমরা সবাই মিলে—

—ঠিক আছে। বউমা যদি সে রকম মনে করেন কখনও, আপনাদের খবর দেব।

—একবার বউমার সঙ্গে দেখা করা যায় না, মা? একটু আলোচনা করে যেতাম ব্যাপারটা—···

—না। মোটেই না। অনুপম ফুঁসে উঠল আবার, আর কোনও কথা নয় তাঁর সঙ্গে। এবার আপনারা উঠুন।

অরুন্ধতীও মাথা নাড়েন সঙ্গে, না বাবা, তাঁর যা মনের অবস্থা। তাকে আর কষ্ট দিতে পারি না। শোকে যেন পাথর হয়ে আছে মেয়েটা! আমিও যে কী করে আছি···

আবার জল এসে গেল তাঁর চোখে। ঝরঝর করে কাঁদছেন।

অনুপম উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। হাতজোড় করে চেঁচিয়ে বলল, প্লিজ, আপনারা এখন চলে যান। আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দিন, দয়া করে।

গলাটা শুনে পলও ছুটে এসেছে। উফ্ উফ্ করে লাফাতে লাফাতে লোকগুলোকে দেখছে রাগী চোখে।

নির্মলবাবুর দল বেশ ঘাবড়ে গেল যেন।

—আচ্ছা, তাহলে আজ আসি মাসীমা। পরে আর একবার—

বলতে বলতে সবাই অরুন্ধতীদেবীর পিছন দিকে চলে যায়। তারপর সেখান থেকেই সরসর করে সরে পড়ল কোনওমতে।

—ঠিক আছে বাবারা, এসো। দরকার হলে আমি ঠিক খবর দেব।

লোকগুলো আর তাকায় না কোনও দিকে। সবার আগে লিডার নির্মলবাবু। কোঁচা সামলে লম্বা লম্বা পা ফেলছেন ভদ্রলোক। তোচন তাকেও ছাড়িয়ে গেল।

পল ক্ষিপ্ত গলায় গরগর করছে সমানে।

অনুপম তাকে সামলায়। জোর করে টেনে ধরে থাকে দুই হাতে।

ওরা বাগান ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়ল এবার। তারপর পিছন ফিরে দেখল কুকুরটাকে। এখনও গরগর করছে। ছাড়া পেলেই হয়তো তেড়ে আসবে। নিজেরা কী যেন বলাবলি করল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পল তবুও ডাকতে থাকে। ডেকেই চলেছে। আশ্চর্য! রাগটা যেন তার পড়ছে না কিছুতেই। সে ঠিক টের পেয়ে যায় এ বাড়ির মনের কথা। তাদের ইচ্ছে অনিচ্ছে। বরাবরই তাই।

দেবযানী কোনও সাড়া না দিয়ে তার আগেই উঠে এসেছে। পায়ে পায়ে নিঃশব্দে তার ঘরে ঢুকে পড়ে। আবার চুপচাপ বসে থাকে তেমনি। চারদিক থিতিয়ে শান্ত হয়ে আসছে আগের মতো।

তবু কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগে। বুকের মধ্যে হঠাৎ এক তোলপাড় করা আলোড়ন। ভয় হয়। এমনি করে কি সব কিছু হারিয়ে যাবে সুমনের? এত তাড়াতাড়ি? এ যে কল্পনাই করতে পারে না। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার।

…সুমন, কী হবে এবার? চারদিক থেকে যে লোভের থাবা

এগিয়ে আসছে সার বেঁধে। অনুপম কী পারবে? পারবে এই জঘন্য লোকগুলোর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে ...

বড় অসহায় আর একা লাগে দেবযানীর এই মুহূর্তে।

নিশ্বাস ফেলে উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। সামনে ধুধু সবুজ মাঠটা নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। ঘন রোদ্রের আলোয় তাল গাছের ছায়াটা দুলছে। আর পলকে নিয়ে সুমন্ত্রকে দৌড়োতে দেখা যাবে না ওখানে। কোনওদিন না। সবুজ ঘাসের ওপর গড়িয়ে যাওয়া টুকটুকে লাল বল .. পল কামঅন্ গো-ও ..

আর কোনওদিন শোনা যাবে না! মাঠটা হয়তো পাল্টেই যাবে এবার।

কিন্তু সুমনের বাগান? তাদের প্রিয় ফুল-ফল-ফসলের খামার বাড়ি? তাদের সেই সব সকাল, বিকেল, মধুযামিনীর সোনালি স্মৃতি? সব, সব কি হারিয়ে যাবে একটু একটু করে?

না, তা সম্ভব নয়। এক ঝলকেই যেন শক্ত করে মন। কিছুতেই তা হতে পারে না। এইভাবে সুমন্ত্রকে একটু একটু করে আড়ালে চলে যেতে দেবে না সে। মনপ্রাণ দিয়ে তাকে ধরে রাখবে। যতদিন সে বাঁচবে ততদিন।

মুখ ফিরিয়ে সুমন্ত্রর ছবির দিকে দেখতে থাকে।

মনে মনে বলে, না সুমন, আমি কখনই হাত ছাড়িয়ে নেব না তোমার থেকে। তুমি দেখো, দেবী তেমনি থাকবে তোমার···

৮

মনে আছে, সুমন্ত্র চলে যাবার পর প্রথম কয়েকটা দিন তাকে একলা শুতে মানা করেছিল সবাই। নাকি, করতে নেই এটা। স্বামী-স্ত্রীর শোবার ঘর, তার মধ্যে এমন একটা ঘটনার পরে, এক-জনকে এসে নাকি থাকতে নেই।

ক্ষমাদি এসে বলেছিল, বউ, আমি শোব তোর সঙ্গে কয়েকটা দিন। আপত্তি নেই তো? আমার শোয়াটা অবশ্য ভাল নয়। ঘুমের মধ্যে বড় এলোমেলো হয়ে যাই, তা তোর কাছে আর লজ্জা কি।

দেবযানী মেনে নিতে পারে না প্রস্তাবটা। কেন, এই বিরাট বাড়িতে তো ঘরের অভাব নেই। তাদের দুজনের বিছানায় এসে কেন শুতে যাবেন ক্ষমাদি। তা হয় না।

ক্ষমাদি বুঝিয়ে বলেন, কয়েকটা দিন এখন একলা ঘুমোতে পারবি না তুই। ভয় ভয় করবে রাত্তিরে—

—কেন ক্ষমাদি? একথা বলছেন কেন?

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে ক্ষমাদির, ওরে, আপনার জন কেউ হঠাৎ এভাবে চলে গেলে, একলা থাকতে নেই রাত্তিরে। সব সময় অন্য লোকের কাছে কাছে থাকতে হয়।

—কেন?

—তাই নিয়ম। বড্ড ভালবাসতো যে তোকে।

—তাতে কী হয়েছে?

—যদি কখনও মূর্তিটুর্তি ধরে দাঁড়ায় এসে। কিছু বলা যায় না। সাধ আহ্লাদ না মিটতেই যারা চলে যায় অকালে, তাদের নিয়েই জ্বালা। সব সময় ছটফট করে বেড়ায়। ঘুরে ঘুরে আসতে চায় নিজের জনের কাছে—

—ক্ষমাদি, কী বলছেন আপনি! গলার স্বরটা কেঁপে ওঠে দেবযানীর।

ভরাট মুখে চোখ দুটো ছলছল করে ক্ষমাদির। চাপা কোনও গভীর দুঃখের স্মৃতিতে বিহ্বল হয়ে থাকেন একটুক্ষণ।

পরে স্বগতোক্তির মতো বলেন, তোর দাদা যখন চলে গেল, তখন আমারও এইরকম হয়েছিল…ঝুনু মানু তখন তো বড় হয়েছে, ওরা আলাদা শোয়। কিন্তু আমি আর একলা ঘরে শুতে পারি না, এত-দিনের অভ্যেস। খালি মনে হয়, এই কে চলে গেল! এই কে মাথার কাছে এসে দাঁড়াল! মুখের ওপর যেন চাপা নিঃশ্বাস পড়ল কার! আর পারি না। পরদিন থেকেই ঝুনু-মানুকে পাশে নিয়ে শুতে আরম্ভ করলাম…

—তারপর?

—তারপরও ব্যাপারটা ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত ওইরকম গা ছম্‌ছম্‌ করতো রাত্তিরে। শেষে এক বচ্ছর পার হতে, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আসতে সব ঠিক হয়ে গেল।

—সত্যি বলছেন ! আপনি বিশ্বাস করেন এইসব—

—আমি একা কেন, সবাই করে ।

দেবযানী অবাক হয়ে দেখতে থাকে ক্ষমাদির দিকে । এও কি সম্ভব ?

ক্ষমাদি মাথা নেড়ে বললেন, ভেবে আর কী করবি, একটু সাবধানে থাকত হবে তোকে এখন । চলাফেরাও করতে হবে বুঝে-সুঝে । বিশেষ করে, অপঘাতে মৃত্যু হলেই ভয়টা আরও বেশি । ওরা প্রিয়জনকে ছেড়ে যেতে চায় না । বারবার কাছে আসতে চায় । তোকে খুউব সাবধানে থাকতে হবে এখন—

—না । ভিতর থেকে কে যেন আর্তনাদ করে ওঠে দেবীর, না ক্ষমাদি । আমি বিশ্বাস করি না এ সব । আপনারা নিজের মতো থাকতে দিন ।

—বলিস কী ?

—হ্যাঁ ক্ষমাদি, প্লিজ । আপনি মাকে বলুন, আমার একটুও অসুবিধে হবে না ।

—অতবড়ো ঘরে, চারদিকে তার জিনিসপত্র ছড়ানো, বিছানা বালিশ, ছবির পর ছবি, বাগানের দিকে অত বড়ো বড়ো জানালা··· মাঝরাতে হঠাৎ যদি ভয় পেয়ে জেগে উঠিস ? ভেবে দ্যাখ ভাল করে বউ—

—ভেবেছি । আমি ভয় পাবো না, দেখবেন ।

—বেশ তাই হবে । আমি তোর ভালর জন্যেই বলছিলাম, বউ ।

—জানি ক্ষমাদি । দেবযানী মাথা হেলায়, কিন্তু আমি পারবো । আমাকে যে একাই থাকতে হবে এখন, সম্পূর্ণ একা···

মনের মধ্যে গুনগুন করে বেজে ওঠে যেন সুমনের প্রিয় সেই গানের কথাগুলো । কতবার শুনিয়েছে দেবী ঃ

···আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে···

একটানা ঝিম ঝিম করে বাজে । আর সে মনে মনে বলতে থাকে, না ক্ষমাদি, না । তোমরা সুমনকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিও না এমন করে । আমি অপেক্ষা করে আছি, যদি সে আসে কখনও···

কান পাতলে এখনও শুনতে পাই তার কথা, হাসির শব্দ, গাড়ির দুরন্ত আওয়াজ, মাতাল হাওয়ার মধ্যে সেই অদ্ভুত গন্ধ…এ সবের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিও না আমায় তোমরা, প্লিজ ক্ষমাদি…

ক্ষমাদি একটু ক্ষুন্ন হলেন যেন। ফ্যাল ফ্যাল করে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর বিমর্ষ মুখে আস্তে আস্তে নেমে গেলেন। একটু দুঃখ হয় তার জন্যে। দেবযানীকে খুবই ভালবাসেন তিনি। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেন না তাকে।

বাইরে বেলা শেষ হয়ে এল। বাগানের দিকটা অন্ধকার! ঝিঁঝির ডাক কানে আসছে। দেবযানী কল্পনা করে, সুমন্ত্র মূর্তি ধরে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। দেখছে একদৃষ্টিতে তাকে। সেই চোখ!

দৃশ্যটা ভাবতেই এক অদ্ভুত রোমাঞ্চে শিউরে উঠতে থাকে তার সারা দেহ। ভয় আর আনন্দের মিলিত অনুভূতিতে সিরসির করে বুকটা।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। আবার কেউ আসছে কি তার কাছে? হয়তো অরুন্ধতীদেবী। বোঝাবেন, না বউমা, এভাবে একলা থাকা ভাল নয়। কেউ একজন থাকুক তোমার সঙ্গে। মনটা একটু অন্যরকম লাগবে। দুটো কথা বলে হাল্কা হতে পারবে।

কথাটা ভাবতেই এক ঝলকে উঠে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয় দেবযানী। না, এখন আর কোনও কথা নয়। কেউ আসবে না এখানে। এটা তার নিজস্ব জায়গা। তার আর সুমনের। সুমনকে ছেড়ে সে এখন আর কোথাও থাকবে না।

চারদিকে শুধু সুমন্ত্র এ ঘরের। তার স্মৃতি, তার ঘ্রাণ। একবার যদি সত্যিই মূর্তি ধরে সে এসে দাঁড়ায়, একটুও ভয় করবে না দেবীর। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আর আনন্দে নিজেকে তুলে দেবে তার হাতে। বলবে, সুমন তুমি আমায় নাও।

ঘরে ঘুরতে ফিরতে তার ছবিগুলোর সঙ্গে দেখা হয় বারবার। চোখে রহস্যের ঝিলিক তুলে এখনও তারা হাসছে। সব ছবির সঙ্গেই জড়ানো একটার পর একটা স্মৃতি। অনেক কথা দুজনের।

টেপ করা আছে তাদের একটা পুরো রাতের সব কথা। নিঃশ্বাস

প্রশ্বাসের শব্দ। মিলনের মুহূর্তে বড় বেশি গোপনীয় আর নিবিড় কথা দুজনের। মাতাল অনুভূতির ঝংকার। পাগলামির এই টেপটা পরে অনেকবার শুনেছিল দুজনে।

দেবযানী লজ্জায় একবার নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছিল এটা। ছি ছি! এ রকম জিনিস কেউ রেখে দেয় নাকি।

সুমন বাধা দিয়েছিল, এই এই, করছ কী?

—না এটাকে আর রাখব না?

—কেন?

—যদি কেউ শুনে ফেলে। ভীষণ লজ্জা করে আমার—

—পাগল হয়েছ, এমন প্রমাণ কেউ হাত ছাড়া করে।

—তার মানে?

—তোমার স্বামী যদি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে। বিয়েটা সুখের হয়নি বলে লটঘট চালিয়ে যেতে চায় অন্য মেয়ের সঙ্গে। চাই কি, বিয়েও করে ফেলতে পারে।

—ভাগ্! যত্তো আজেবাজে কথা। করো না তুমি লটঘট, আমি দেখি—।

—ঠাট্টা নয়, এইখানিই হবে তখন তোমার প্রধান অস্ত্র। একবার চালিয়ে দিলে টেপটা, উকিল-ব্যারিস্টার-জজ, সব ভিরমি খেয়ে পড়বে তোমার দিকে—

—যাঃ অসভ্য কোথাকার, সে হাত তোলে সুমনের দিকে। চওড়া বুকের ওপর কিল মারতে মারতে বলল, দেখো, আমি ঠিক ওটা নষ্ট করে ফেলব একদিন।

—করলে পস্তাবে। সেধে এমন একটা মোক্ষম প্রমাণ নষ্ট করে কেউ?

—কীসের প্রমাণ?

—আমাদের ভালবাসার।

—ভালবাসার প্রমাণ! তার মানে?

—মানে এই ধরো, তোমার স্বামী তোমাকে কতটা ভালবাসে, তার আবেগের ঘনত্ব কীরকম, কতক্ষণ ধরে ভালবাসে, তার স্ত্রী দেবযানীই বা কী ভাবে সাড়া দেয় তাতে…

—এই সুমন ভাল হবে না বলছি, মারব আমি, ভীষণ মারব

তোমায়…

দুম দুম করে দ্রুত হাত চলে দেবযানীর।

তার মধ্যেই সুমন তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে। প্রবল আলিঙ্গনে বিবশ প্রায় দেহ। উষ্ণ ঠোঁট দুটো ক্ষুধার্তের মতো শুষে নিচ্ছে তার সব কথা, সব প্রতিবাদ…

এক এক সময় ট্রাঙ্ক খুলে জামাকাপড়গুলো হাটকায়। টেনে বার করে সুমনের ব্যবহার করা পোশাক। এ ব্যাপারে ও খুবই শৌখিন ছিল বরাবর। বেশ সুন্দর সাজগোজ করত। সেই প্রথম আলাপের দিন থেকেই চোখে পড়েছিল। প্যান্ট-শার্ট, জুতো-জ্যাকেটের অদ্ভুত ম্যাচিং কম্বিনেশান। দেবীর নিজেরও পছন্দ ছিল এটা।

এখনও পোশাকগুলোর গন্ধ তাকে টানে। আস্তে আস্তে নাকের কাছে ধরে এক একবার। অনেক ভিতর থেকে যেন সেই পরিচিত ঘ্রাণ! দেবী এখনও টের পায়। ঠিক ধরতে পারে। সুমন্তের ঘ্রাণ! আহ্ সুমন!

সন্ধের পর সেদিন ছাতে এসে দাঁড়াল। মেঘের চাঁদর ছিঁড়ে একফালি চাঁদ সবে মুখ বাড়িয়েছে। কী মনোরম দৃশ্য চারিদিকে। মন কেমন করে যেন। চাঁদের আলো মেখে ঝিকমিক করে কাঁপছে ইউক্যালিপটাসের পাতাগুলো। মসৃণ ধবল সাদা গাছের গুঁড়ি। দীর্ঘদেহী এক জোয়ান পুরুষের মতো। অদ্ভুতভাবে দুলছে জ্যোৎস্নার মধ্যে। সুন্দর গন্ধ ইউক্যালিপটাস পাতার। সাঁ সাঁ শব্দের আলোড়ন…

সেই শব্দ আর ঘ্রাণ…তাকে ঘিরে ধরছে সোনালি আলোর মধ্যে। সুমন্ত্র কি তবে জেগে উঠল এইভাবে?

জানে না, কতক্ষণ আত্মবিস্মৃত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার মধ্যে।

দেখতে দেখতে পুরো দুটো বছর কেটে গেল। তবু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে পারে না দেবযানী।

বাইরে থেকে অবশ্য তেমন কিছু বোঝা যায় না। কথা বললেও না। শুধু একটু গম্ভীর আর আত্মমগ্ন। কিন্তু কোনও হা-

হুতাশ নেই।

দুঃখটাকে বুকের গভীরে যেন গুটিয়ে রাখে কোথাও। নির্জন অবকাশে শান্তভাবে তাই সে মেলে ধরে নিজের কাছে। যেন এটাই তার জীবনের বড় আদরের সম্পদ এখন।

অরুন্ধতীদেবী তবু কাছে এসে বসতে চান। প্রায়ই সঙ্গ দিতে চান তাকে। বারবার বুঝিয়ে বলেন, না মা, সন্ধেবেলায় এমন মুখ ভার করে বসে থাকতে নেই। চলো আমার ঘরে—

—কেন মা? এই তো বেশ আছি।

—পাগলি মেয়ে! কালকের সেই বইটা, আমায় পড়ে শোনাবে না আমায়? কী যে ভাল লাগে তোমার পড়া।

দেবযানী নিঃশ্বাস ফেলে তাকায়। মৃদু গলায় বলে, একদম ভাল লাগছে না মা। একটু পরে, আপনি যান।

চুপচাপ তবুও বসে থাকেন অরুন্ধতীদেবী।

বাগানে একটানা পাখিদের ডাক। ঘরে ফেরার সময় হল সবার। দূরে বড় রাস্তায় গল্প করতে করতে চলেছে কারা। তাদের হো হো হাসি।

অরুন্ধতীদেবী মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন আস্তে আস্তে। কিছু একটা বলতে গিয়েও যেন পারছেন না। চুপচাপ দুজনেই।

একটুক্ষণ পরে বললেন, আমি সব বুঝি মা, সব বুঝি। কিন্তু মন খারাপ করে আর কী করবে। একবার আমার দিকে দেখ—।

দেবযানী হঠাৎ তাকায় তার দিকে। বুকভরা দুঃখ নিয়ে বসে আছেন যেন।

বলতে থাকেন, আমার কপালটাই যে পোড়া বউমা। সারাজীবন আমি ভয়ে কাঁটা য়ে থেকেছি·· ওর বাবাও যে গিয়েছিল এমনি তাজা বয়েসে, সেই থেকেই মনে মনে ভয়। তোমায় আর কী বলব, কী প্রকাণ্ড জোয়ান চেহারার মানুষ। সব সময় হাসি খুশি···মাত্র তিন দিনের জ্বরেই সব শেষ। চোখের সামনে বসে বসে দেখতে হল, কিছুই করা গেল না। হা—। কী করবে মা, সবই আমাদের ভাগ্য···

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদেন অরুন্ধতীদেবী।

দেবযানী কাঠ হয়ে গেছে যেন। বুকের মধ্যে ঝিমঝিম করে

কাঁপছে। কী বলবে সে তাঁকে।

দেখতে দেখতে তার নিষ্পলক চোখ দুটোও জলে ভরে আসে এক সময়।

কতক্ষণ কেটে যায় একভাবে তাদের। পাশাপাশি বসে থাকে ভারাক্রান্ত মনে।

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পুজোর ঘরে যাবার সময় এখন। তবু বসে আছেন অরুন্ধতী।

সন্ধের ঝিরঝিরে হাওয়া উঠল বাগানে। চাঁদের আলো ফুটছে একটু একটু করে। মিষ্টি গন্ধ কী ফুলের। লেবু গাছে ফুল ফুটল হয়তো। টির্ টির্ করে কী পাখি ডাকছে ঝোপের আড়ালে।

অরুন্ধতী হঠাৎ বলে উঠলেন, তোমায় একটা কথা বলবো মা ?

—বলুন। দেবযানী মুখ তুলে তাকায় তার দিকে।

—আমি বলছি, তুমি বরং আবার কলেজে টলেজে ভর্তি হয়ে যাও পড়াশুনো নিয়েই থাক। দেখবে বন্ধুবান্ধব পেলে মন অন্য-রকম হয়ে যাবে।

দেবযানী চুপ। কোনও উত্তর দেয় না কথার।

—শেষে ভাল পাশটাশ করে স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াও।

অজান্তে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে দেবযানীর। সে মাথা নিচু করেই থাকে।

—দিনের পর দিন এমন মনমরা হয়ে থেকো না, মা। বেঁচে থাকার যে অনেক জ্বালা, হাজারটা দায়···

হঠাৎ ঝিঁঝির দল আবার ডেকে উঠল বাগানে। একটানা স্বরটা ঝিঁ-ই ঝিঁ-ই করে করে ঘুরছে কথার সঙ্গে।

—আমি সত্যি বলছি মা, তুমি যদি আবার নতুনভাবে জীবনটা শুরু করে সুখী হতে পারো, নতুন ঘর সংসার করে সাধ আহ্লাদ মেটাও···আমি, তাতেও বাধা হবো না। আমি আমি খুব খুশিই হবো তাতে···তুমি দেখো···

দেবযানী চমকে দুলে উঠল এবার। ঝিঁঝির ডাকটা যেন তীব্র-ভাবে বিদ্ধ করে তাকে। স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অপলক।

তিনি আবার বলতে থাকেন, না এতে কোনও অন্যায় নেই। নিজেকে তিলে তিলে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে সে অনেক ভাল। আমি সত্যি বলছি মা, আমার কোনও অমত হবে না তাতে···তোমার এই বয়েসে···

কথা শেষ হয় না! শেষ দিকে কান্নায় বুজে আসে তাঁর গলা।

৭

না, বাগানটাকে আর ধরে রাখা গেল না।

নিত্যি নতুন একের পর এক লোক চলে আসছে। সবারই নজর ওইদিকে। খড়দা থেকে নির্মলবাবুর দল, হরিপালের শ্রীমন্ত চৌধুরী, চন্দনগরের বলাইবাবু। লোক আসার যেন কামাই নেই। হাওড়ার ধনিকলালজি তো সঙ্গে বায়নার জন্যে নগদ টাকা নিয়েই হাজির একদিন সকালবেলায়।

অরুন্ধতীদেবীর মত বদল হয়।

খানিকটা তিতি বিরক্ত হয়েই বলতে শুরু করেন, আর কেন মা, অনেক হয়েছে। এবার একটা ভাল খদ্দের দেখে—

—মা! কী বলছেন আপনি!

—যা বলছি তোমার ভালর জন্যেই বলছি। এত বড় সম্পত্তি থাকার অনেক জ্বালা। তার চেয়ে বেচে দিয়ে ঝাড়া হাত পা হয়ে শান্তিতে থাক, মা। তুমি নিজে তো দেখতে পারবে না।

—অনুপ, অনুপ তো আছে। ও ঠিক চালিয়ে নেবে মা।

—দেখছে, কিন্তু ও আর কতদিন দেখবে। আমি বলছি, তার চেয়ে এখন সময় থাকতে একটা ব্যবস্থা করে ফেলো। কেন মিছি-মিছি অশান্তি পোয়াবে মা, তুমি দিনের পরদিন···।

—মা! দেবযানী মাথা নিচু করে থাকে চুপচাপ। কী করে বোঝাবে সে মনের কথাটা তাঁকে।

চেষ্টা করে অনেকবার। তবুও ঠিকমতো বলা হয় না। শেষ পর্যন্ত যেন হাল ছেড়ে দিয়ে অনিচ্ছার সঙ্গেই রাজি হতে হল।

অরুন্ধতী খুশি হলেন। কথাও প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গেল। পাকা কথা।

ত্রিবেণী থেকে সদানন্দবাবু আসবেন আজ। তিনিই কিনবেন থামার বাড়িটা।

কথাবার্তা অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে। আজ আসবেন তিনি তাঁর পার্টনারকে নিয়ে। দুজনে মিলে দেখেশুনে আজই একটা লেখাপড়া করবেন।

সকাল থেকেই মনটা ভার দেবীর। সে নিরুপায়। সুমন্ত্রর হাতে গড়া সেই স্বপ্নের বাগান! আর ধরে রাখা গেল না। যেটা সে কোনওদিন কল্পনাই করেনি। তবু তাই হতে চলেছে।

শেষবারের মতো আজ একবার যাবে দেবযানী। মুখোমুখি গিয়ে একবার দাঁড়াবে সেখানে। সেই প্রিয় পরিচিত গন্ধ! পাখিদের গান! জীবনের অজস্র স্মৃতিতে ভরা তাদের সেই প্রিয় বনভূমি! আজও হয়তো তেমনি অপেক্ষা করে আছে পথ চেয়ে!

সে নিঃশ্বাস টানবে ধু ধু ফাঁকা মাঠের হাওয়ায়। একদিকে মৌমাছির গুঞ্জন, ঝিন্ ঝিন্ ধ্বনি ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। অন্যদিকে মাতাল করা মৌরি ফুলের গন্ধ। আহ্! মন ভেঙ্গে যাচ্ছে যেন কল্পনা করে।

তবু সে মেনে নিল অরুন্ধতীদেবীর কথা। ভাবা যায় না। কিন্তু উপায়ই বা কী ছিল তার?

মার মুখে রোজ সেই এক কথা। এক যুক্তি।

—না মা, আর ঝামেলায় দরকার নেই আমাদের। ওসব সামলানো কি চাট্টিখানি কথা? না, তোমার পক্ষে সম্ভব? ওই বাগান বাগান করে তো একজনের প্রাণটাই গেল, আর দরকার নেই···

—তবু তাঁর একটা স্মৃতি, মা—

দেবযানী কাতর গলায় বলতে চেষ্টা করে।

—কীসের স্মৃতি? সেই যখন রইল না, তখন কতকগুলো গাছপালা আর বনবাদাড়ের সম্পত্তি রেখে কী হবে আমাদের?

বুকের মধ্যে টনটন করতে থাকে তার। তবু মুখের ওপর কিছু বলতে পারে না। নিঝুম হয়ে থাকে সারাক্ষণ।

পরে ভাবে, হয়তো সত্যিই আর রাখা সম্ভব নয় এটা। তাকে হাত ছাড়িয়ে নিতে হবে। সুমন্ত্রের এই শেষ স্মৃতি থেকেও।

ভরসা ছিল অনুপম। শেষ ভরসা।

কিন্তু সেও পারল না। তার ওপরও সমানে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন অরুন্ধতীদেবী। প্রায় সোজাসুজিই বললেন,

—কী হল, ও অনুপ? এবার ঠিকঠাক করে ফেলো—

—কীসের মাসিমা? সব বুঝেও একটু রহস্য করে এড়িয়ে যেতে চায় অনুপম।

—বাঃ তোমাকে বললাম না? ওই বাগানটার কথা।

—বাগান? কেন, সব ঠিকই তো চলছে। মুরলী খুব খাটছে আমার সঙ্গে। এবার যা মটরশুঁটির চাষ হয়েছে না মাসিমা, দারুণ! বাঁধাকপিও দেখবেন। তাছাড়া পালংশাক, টমেটোও কিছু খারাপ হয়নি।

—ওসব কথা ছাড়ো এখন। আমি তা বলছি না।

—ও হ্যাঁ, পোলট্রির প্ল্যানটাও মাথায় আছে আমার।

—না বাবা, না। ওসবে আর দরকার নেই আমাদের। তোমার দাদাই যখন রইল না, তখন আর কী হবে ও বাগান রেখে। তারপর তুমি কবে হুট করে একদিন চাকরি বাকরি নিয়ে চলে যাবে—তোমারও তো ভবিষ্যৎ আছে। তখন?

—আমি—মানে বলছিলাম···

—না বাবা। বউমা একা, ছেলেমানুষ। এসব ঝামেলা আর রাখতে চাই না। বিক্রিবাটা করে তুমি বরং টাকাটা বউমার নামে জমা করে দেবার ব্যবস্থা করো।

অনুপমের কথা বন্ধ হয়ে যায়। ঘাড় গুঁজে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে থম্ মেরে। বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছিল না।

পরে আলাদা তাকে এসে বলল, ঝিনিদি বাগানটা তুমি সত্যি বেচে দিতে চাও?

—তুমি কী বলো? দেবযানী ম্লান হেসে তাকায় ওর দিকে।

অনুপম চোখ নামিয়ে নিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তাহলে কী হবে? আমার পক্ষে তো আর জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয়···

—তাহলে অনুপ? দেবযানী করুণ চোখে প্রশ্ন করে আবার।

—তবুও···তুমি যদি···। অনুপম কী বলবে যেন খুঁজে

পায় না।

—না অনুপ, দেবযানী মাথা নাড়ল, আমিই কি আর জোর করে কিছু বলতে পারি? একটু ভেবে দ্যাখো—।

হতাশ ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে থাকে অনুপম। মুখটা বড় করুণ।

নিজের মনেই বলতে লাগল, এমন সুন্দর বাগানটা আমাদের! কত স্বপ্ন আর পরিকল্পনা ছিল তাঁর এটাকে ঘিরে! তুমি তো সবই জান। সব কিছু ফেলে দিনের পর দিন ছুটে আসত…কেন ঝিনিদি…

দেবযানী কোনও জবাব দিতে পারে না। স্বপ্নের ঘোরেই যেন অনুপম কথা বলছে।

না এসে উপায় ছিল না। বাগানটা যেন ডাক পাঠাত। আমিও পারি না এখনও না গিয়ে। কিন্তু এবার সব শেষ। কে জানে, কার হাতে পড়বে শেষ পর্যন্ত। সে কেমন মানুষ! ভালবাসতে পারবে কিনা এটাকে। গাছ গাছালি, ফুলের বাগান, সবজি ক্ষেত, বুলবুলি আর দোয়েলের গান। ঘাস ফড়িং-এর মিছিল। হয়তো সে এসব কিছু উজাড় করে দিয়ে একটা বড়সড় ফ্যাক্টরি বানাবে। কালো প্রকাণ্ড একটা চিমনি মাথা তুলবে আকাশে। তারপর সারাদিন ধরে গলগল করে কালো ধোঁয়া ছাড়বে…ভাবতে কষ্ট হচ্ছে না তোমার…

বলতে বলতে আপনা থেকেই গম্ভীর হয়ে গেল অনুপম। মনে মনে ছবিটা কল্পনা করে হয়তো কষ্ট পাচ্ছে। খুবই কষ্ট। বরাবরই অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ছেলে।

কিন্তু আশ্চর্য! একবারও সে সরাসরি সমুদার নামটা মুখে আনল না। সব সময় যে নামটা ওর মন জুড়ে আছে। তবু ইচ্ছে করেই যেন এড়িয়ে গেল।

বেচারি! দেবযানী ভেঙ্গে পড়বে ভেবেই ও বলে না। বুদ্ধি করে থেমে যায় বারবার কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে। বোঝে না, এই দু বছর ধরে সেই একটি সত্তাই তাকে ঘিরে আছে কী ভাবে। দিনে, রাতে, স্বপ্নের মধ্যেও।

স্বপ্নের ভিতর এখনও দেখা পায় কতদিন…জঙ্গল থেকে বেরিয়ে

আসছে সুমন···হাত বাড়িয়ে তাকে আদর করে দেবী, দেবযানী··· আমার তিলোত্তমা···

পরে ঘুমভাঙা চোখে গোটা রাত কেটে যায়। কেউ জানে না।···কী দুঃসহ এক চাপা যন্ত্রণার ভারে টন্‌টন্‌ করে তার বুক···

না, অনুপমকে এসব কথা বলা যায় না।

পল খুব উৎসাহিত হয়ে ডেকে উঠল হঠাৎ। আদরের ডাক। নিশ্চয় অনুপমকে দেখতে পেয়েছে এবার।

আনন্দে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যায় গেট পর্যন্ত। বাইরে থেকেই আদর করে ওকে ডাকছে অনুপম। এক লাফে হাতে ভর দিয়ে পল দাঁড়িয়ে পড়ে। মুখ ঘষছে কোলের মধ্যে।

বিব্রত অনুপম পুলওভারটা সামলাতে ব্যস্ত তার। সুন্দর রঙিন ডিজাইনের ওপর থাবাটা না লাগে।

বারবার সরিয়ে দেয় তাকে। আর বলে, নো, নো পল। এই তো—খুব হয়েছে। আর নয়, এবার শান্ত হয়ে বোসো দিকি···

খুব এক চোট পিঠ চাপড়ে আদর করতে হয়। তারপর শান্ত হল পল।

ওকে ছেড়ে ভিতরে ঢোকে অনুপ। ওপরের দিকে তাকাল। দেবযানীকে দেখে যেন ম্লান হাসি ফোটে মুখে। হাত নাড়ল দু-বার। তারপর মাথা নীচু করে সোজা অরুন্ধতীদেবীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মুখ দেখে ওর মনের অবস্থাটা আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না। যে বাগান খামার নিয়ে এতকাল পাগল হয়েছিল ছেলেটা, অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনায় মশগুল হয়ে থাকত, তা আজ থেকে কোনও এক সদানন্দবাবুর হয়ে যাচ্ছে। আঘাতটা সত্যিই খুবই কঠিন।

অরুন্ধতীদেবীর গলা পাওয়া যাচ্ছে নীচে। খুব বোঝাচ্ছেন অনুপমকে নিশ্চয়। হয়তো পুরো পাঁচ লাখের ওপরই জোর দিতে বলছেন। না হলে সাড়ে চার। তার বেশি আর ভরসা পাচ্ছেন না। টাকার অংকটা নিয়ে কদিন ধরেই তিনি বেশ চিন্তিত। তাকেও বুঝিয়েছেন। একসঙ্গে নগদ টাকাটা পাওয়া গেলেই এখন নিশ্চিন্ত হতে পারেন তিনি।

তারপরও হয়তো বুঝিয়ে বলছেন, ওরা রাজী হয়ে গেলে কী কী করতে হবে। সেই বউবাজারের উকিল মেসোকে গিয়ে ধরার কথা। কীভাবে লেখাপড়া হবে, তার বিস্তারিত পরামর্শ। আর মাঝে মাঝেই চোখের জল। হা-হুতাশ ছেলের জন্যে, তাদের এমন সাধের বাগানটার জন্যে। বউমার জন্যে…

পরপর বাঁধাধরা ছবি। ওপরে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট অনুমান করতে পারে সব দেবযানী।

অনুপমও গলা তুলে কী সব বলছে। আশ্বাস দিয়ে চলেছে।

…হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই হবে মাসিমা, ঠিক আছে।…কোনও চিন্তা করবেন না। পাগল হয়েছেন ?…আমি তো আছি।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। আর গলা পাওয়া যাচ্ছে না কারও। নতুন করে কি ভেবে দেখছে ওরা ? অন্যরকম কিছু ? দেবযানী কান পেতে থাকে।

সিঁড়িতে অনুপমের জুতোর শব্দ। ধুপধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে আসছে দোতলায়।

দূর থেকেই হাঁকল, ঝিনিদি রেডি তো ? এবার বেরোতে হবে—।

আচ্ছন্ন ভাবটা ঝেড়ে ফেলে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল দেবযানী।

—এসো অনুপ। আমি বসে আছি তোমার জন্যে।

ঘন ধূসর রঙের ট্রাউজার্স, ওপরে বর্ডার তোলা সেই সবুজ পুলওভার। কোমরের দুপাশে হাত রেখে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে। মাত্র এক নিঃশ্বাসের দূরত্বে। হঠাৎ যেন চমক লাগে দেবযানীর। শির্‌শির্‌ করে ওঠে বুকের ভিতরটা।

বলতে ইচ্ছে হল, বাঃ তোমাকে কী সুন্দর মানিয়েছে অনুপ ! ভীষণ স্মার্ট !

কিন্তু বলল না। মৃদু হাসল একবার তাকিয়ে দেখে।

অনুপমও যেন ইতস্তত করে কিছু বলতে। এই মুহূর্তে যেন অন্য একজন এসে দাঁড়িয়েছে মাঝখানে। তাই বলা হয় না।

দুজনেই যেন এড়িয়ে গেল সেটা। এই মুহূর্তের অনিবার্য

কথাটা।

একটু থেমেই পরক্ষণে তাড়া লাগায় অনুপ। একি ঝিনিদি, তুমি যে এখনও তৈরি হওনি? আশ্চর্য!

—একটু বোসো। দেরি হবে না আমার।

—খুব তাড়াতাড়ি, গ্যালপিং ট্রেনটা মিস করব না হলে।

—হোক না মিস্। কী দরকার আমাদের এত তাড়াতাড়ি গিয়ে?

—তা ঠিক। অনুপ দমে যায় একটু। মাথা নামিয়ে বলল, কিন্তু যেতে যখন হবে…

—তার জন্যে অনেক সময় পড়ে আছে, অনুপ। তুমি বোসো, একটু চা-টা খাও ; খেয়ে এসেছ কিছু…নাকি,—

অরুন্ধতীদেবী চলে এসেছেন ততক্ষণে। বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু মুখে দেবে বৈকি। তুমি যাও বউমা, কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হয়ে নাও। আমি চায়ের জল চাপাতে বলছি অনুপমের। সুরমা ময়দা মেখে রেখেছে—ওই সঙ্গে গরম গরম দুখানা লুচিও ভেজে দেবে—।

অনুপম বলে, আমি খেয়েই এসেছি মাসিমা। আর দরকার নেই কিছু।

—সে তো কোন্ সকালে খেয়ে এসেচো, বাবা। জোয়ান বয়েস তোমাদের, কতদূরে যাবে। দুখানা গরম গরম মুখে দিয়ে যাও এখন—

—ঠিক আছে। দিতে বলুন তাহলে চটপট চারখানা। এত করে বলছেন যখন, তখন খেয়েই নি। হাসল তার দিকে তাকিয়ে রহস্য করে অনুপম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি নীচে চলে এসো বাবা। এক্ষুণি হয়ে যাবে।

অনুপ চলে গেল তাঁর সঙ্গে।

পাশের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবযানী। তার ছোট্ট সাজবার ঘর। বুদোয়ার। মনের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছিল সুমন্ত্র। তিনদিকে তিনখানা আয়না। কসমেটিকস্ টেবিল। ড্রেসিং

টেবিল। পরপর ছোটবড় ওয়ার্ডরোব। আরও কত ছোটখাট টুকিটাকি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক হয়েই পোষাকগুলো খুলতে থাকে সে এক এক করে। সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর। আয়নার মধ্যে ছবিটা দেখে সহসা চমক লাগে। কতদিন পরে নিজেকে দেখে এমন করে! ঠিক পিছনে সুমন্তের ছবি। তার দিকেই যেন কৌতুকভরা চোখে তাকিয়ে। ইচ্ছে করেই লাগিয়ে রেখেছিল। নিজেকে দেখতে দেখতে এমনি বারবার চোখাচোখি হয় তার সঙ্গে।

একবার চোখ বন্ধ করল দেবযানী। আবার খুলল। অদ্ভুত লাগে যেন। নিজের নিরাবরণ সুঠাম শরীরটা যেন তাকে বিদ্ধ করছে এই মুহূর্তে।

সুমন নেই! অথচ সব কিছু তেমনি অটুট আছে। তাদের গোপন ভালবাসার স্মৃতি নিয়ে মাথা উঁচু করে উদ্ধতভাবে বেঁচে আছে। ভয়ংকর এই বেঁচে থাকা। নিজেকে অপরাধী লাগে যেন। অসঙ্গত এই অস্তিত্বের জন্যে।

চাপ ধরা এক অদ্ভুত অনুভূতি সারা শরীর জুড়ে। তার মধ্যে এক এক করে নতুন জামা-কাপড়গুলো পরতে থাকে। হালকা পেনসিল টেনে নিল ভুরুতে। মৃদু গোলাপি লিপ স্টিকের ছোঁয়া। পাউডার পাফ্ বোলানো ঘাড়ে গলায়। পারফিউম মিস্ট স্প্রে করা হাতে, বুকে, অভ্যেসমতো ভেতরের জামায়—।

ভেতরে লাগাতে গিয়েই থেমে যায়। বুকের খাঁজে জড়িয়ে থাকা তার সেই সুদৃশ্য তিলগুলো। পাগল হয়ে উঠত সুমন যেদিকে তাকিয়ে। এখনও তেমনি চকচক করে চোখে পড়ে। আর সুমনকে মনে করিয়ে দেয়, দেবী আমার তিলোত্তমা, তিলোত্তমা···আহ্···

সেই গমগমে আবেগভরা গলার আদর! ভুলতে পারবে না কখনও এ জীবনে। বুকের মধ্যে হঠাৎ দোল খেয়ে ওঠে যেন।

কোনমতে সাজগোজ শেষ করে ঘরটা ছেড়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল দেবী।

স্টেশনে পৌঁছোতে দেরিই হয়ে গেল। সিটি বাজিয়ে, সবুজ আলো তুলছে গার্ড সাহেব। লোকজন ছুটছে।

সেই মুহূর্তে ওরাও পা দিল।

অনুপম হতাশ হয়ে বলে, না, ঝিনিদি। আর হল না। ছেড়েই দাও এটা। তুমি পারবে না—।

—তুমি চলো তো, পা চালাও। কুইক—

বলেই চলার বেগ বাড়ায় দেবযানী। চারিদিকে অজস্র মানুষের ভিড়। হৈ হট্টগোল। ভেণ্ডার, প্যাসেঞ্জার, ফিরিঅলা। সবাই ছুটোছুটি করছে। একটা অদ্ভুত জটিলা ব্যস্ত মানুষদের। যেন দিশেহারা লাগে।

তার মধ্যেও এঁকে বেঁকে তরতর করে পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগোতে এগোতে বলল দেবযানী, ঠিক পেয়ে যাব অনুপ। এই তো এসে গেছি—

—পারবে তুমি?

ইঞ্জিনে হুইসিল বাজল তীব্র স্বরে। গার্ড সাহেব ফ্ল্যাগ নাড়ছে আবার। দুপাশে লোক ছুটছে হুড়মুড় করে। উদ্দাম স্রোত মানুষের!

—একটু ছুটবে ঝিনিদি, ছেড়ে দিল যে।

—ঠিক আছে ছোটো, ওই সামনের কামরাটা অনুপ—

বলেই ভিড়ের সঙ্গে ছুটল দেবযানী। পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে দারুণ ছোটে। উচ্ছ্বসিত চোখে মুখে চিকচিকে ঘামের কণা। খোঁপাটা ভেঙ্গে পড়েছে পিঠের ওপর। পাশের লোকগুলো তাকিয়ে দেখে। ভিড়ের মধ্যে এক নারী প্রায় হরিণীর মতো ছুটতে ছুটতে সবাইকে পিছনে ফেলে যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতেই ক্ষিপ্ত বেগে এক চলন্ত কামরার মধ্যে লাফিয়ে উঠে পড়ল। এক ঝলক বিদ্যুতের মতো যেন। দৃশ্যটা চোখে না পড়ে যায় না।

—সাবাস ঝিনিদি, সাবাস। অনুপম বলে উঠল।

ততক্ষণে পিছন থেকে সে বুক আড়াল করে তাকে ভিড়ের ধাক্কা থেকে বাঁচায়। সেইভাবেই বলে উঠল, পুরো দশ পয়েন্ট দিলাম। ওঃ তোমার জবাব নেই। এখনও ইচ্ছে করলে হানড্রেড মিটারে নাম দিতে পারো তুমি।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে দেবযানীর। মুখ ঘামে ভিজে। তার মধ্যেও মৃদু হাসল একটু।

আশপাশের লোকগুলো তাকিয়ে দেখছে। বুঝতে চেষ্টা করছে যেন কিছু একটা।

অনুপম বলল, আর একটু ভিতরের দিকে যাবার চেষ্টা করো। এখানে দাঁড়ানো যাবে না, দারুণ ভিড় হয়ে যাবে।

তাকে সামলে ভিড় ঠেলতে ঠেলতেই এগোয় অনুপম, এই যে দাদা, একটু যেতে দিন আমাদের। প্লিজ —

—কোথায় আর যাবেন ?

—একদম ভেতরে। আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না।

অনিচ্ছে সত্ত্বেও লোকগুলো একটু পাশ দেয়। যাবার মতো নয়। তবু ঠেলেঠুলেই এগোতে থাকে ওরা।

কিন্তু ভেতরটা পুরো ভর্তি। অনুপ একটা জায়গা খোঁজে তার মধ্যেও। দেবযানী খুবই হাঁপিয়ে পড়েছে। কখনও অভ্যেস নেই এভাবে যাতায়াতের। এতটা পথ। কষ্ট হবে দাঁড়িয়ে যেতে।

কোনও একটা বেঞ্চিতে ম্যানেজ করতেই হবে। অভ্যস্ত ডেলি প্যাসেঞ্জারের চোখে নজর করে চারদিকে।

কোণের দিকে জানলার পাশে দেখল। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সপরিবারে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। মধ্যবয়েসী, বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা। অনেকটা জায়গা জুড়ে রেখেছেন।

সেদিকেই এগোল দেবযানীকে নিয়ে। এসো ঝিনিদি, এখানে বোধ হয় হয়ে যাবে।

দুজনে সামনে এসে দাঁড়ায়। দেখি দাদা, একটু চেপে বসুন আপনারা।

—কোতায় চেপে বসব বলুন দিকি ? জায়গা আছে ?

—হয়ে যাবে। একটু চেষ্টা করুন না। আমার এই দিদিকে একটু বসতে দিন আপনাদের সঙ্গে।

ভদ্রলোক উসখুশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত দেবযানীকে দেখে হয়তো রাজী হয়ে গেলেন। বাচ্চাটাকে সরিয়ে নিলেন একটু।

অনুপম বলল, বসে পড়ো ঝিনিদি।

—আর তুমি ?

—আমি রোজ বসতে পাই নাকি ? এই রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে যাই। অভ্যেস হয়ে গেছে!

—এসো না, ভাগ করি বসি দুজনে। হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে, পরে দেখা যাবে। এর মধ্যে খালিও হয়ে যেতে পারে। এখন তুমি বসো তো—।

গ্যালপিং ট্রেনটা স্পিড নিচ্ছে এবার। একটা ব্রিজ পেরিয়ে গেল নীচে। ঝম্ ঝম্ শব্দ। দুলছে গোটা শরীরটা। জানলার বাইরে ধু ধু ফাঁকা মাঠ। এখনও হালকা কুয়াশা জড়িয়ে আছে দূরে দূরে। কেমন শান্ত স্তব্ধ দেখাচ্ছে দৃশ্যগুলো। তার মধ্যেই দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে ট্রেনটা। আরও একটা স্টেশন বেরিয়ে গেল চোখের পলকে। নাচতে নাচতে আরও একটা লেভেল ক্রসিং। হু হু ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা আবার···

দেবযানী চোখ মেলে একভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। প্রচণ্ড ঘট ঘট শব্দ গাড়িটার। কথা বলা যায় না। তাই চুপচাপ মগ্ন হয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে শরীরটা দুলছে। তালে তালে উঠছে, নামছে। আর ঘুম জড়িয়ে আসছে যেন দু-চোখে। কাল গোটা রাত প্রায় না ঘুমিয়ে কেটেছে তার।

না, এখানে ঘুমোনো যায় না। গা ঝাড়া দিয়ে টান টান হয়ে বসল এবার। পাশের ভদ্রলোকের চোখ তার দিকেই। আড় চোখে সমানে নজর করে চলেছেন। চকচকে লোভের দৃষ্টি! অথচ মুখে একটা গোবেচারি গোবেচারি ভাব।

গায়ের আঁচলটা জড়িয়ে নিল দেবযানী।

অনুপমের দিকে দেখল একবার ওপাশে। সেই একভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। গম্ভীর মুখ। মনে মনে কী যেন ভাবছে। কোনও চেষ্টা নেই বসবার। পরের জংশনে না পেঁছনো পর্যন্ত জায়গা মিলবেও না হয়তো। হয়তো তখনও এমনি দাঁড়িয়েই থাকবে··· ভীষণ স্মার্ট দেখাচ্ছে আজ ওকে সোয়েটারটার জন্যেই হয়তো··· তবু বড় মুখ চোরা ছেলে, স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারে না, নিজের প্রয়োজনের কথাও না···বরাবরই এমনি···

ভাবতে ভাবতে আপনা থেকেই কখন চোখের পাতা দুটো বুজে আসে দেবযানীর।

ট্রেন থেকে নেমে বেশ অনেকটা পথ রিকশায়। তারপর বাগানের কাছে আসতেই রিকশাটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোল ওরা।

কথা বলে না দেবযানী। দুপাশের জঙ্গল থেকে এক অন্যরকম গন্ধ বেরিয়ে আসছে। পাতা ঝরার শব্দ। কাঠবিড়ালি মুখ বাড়াল একটা গাছের আড়াল থেকে। সবই অন্যরকম লাগে আজ।

চোখে পড়ে সেই দীর্ঘ মাথা উঁচুকরা গাছগুলোর সারি। এখনও প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে পর পর।

সুমন্ত্র মোটরবাইকে বসেই বলেছিল, দেবী, দেখছ? ওখান থেকেই সুরু আমাদের বাগান…ওই যে গাছগুলো…

সেই প্রথম দিন! সুমনের পিঠ থেকে মুখ তুলে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল।

—এদিকে এখনও কী রকম শীত দেখেছ, ঝিনিদি। সকালবেলা আরও পড়ে। অনুপম বলে উঠল হঠাৎ।

—হ্যাঁ, তাই দেখছি। আচ্ছন্নের মতো জবাব দিল দেবযানী। এখনও যেন মনে মনে জড়িয়ে আছে সে সুমনকে। মোটর-বাইকের ঝাঁকুনিতে দুরন্ত শরীরটা বুকের মধ্যে লাফিয়ে উঠছে। তার শব্দ, তার গন্ধ…জড়িয়ে ধরছে যেন চারদিক থেকে। মনে হচ্ছিল এতদিন কেন একবারও আসেনি সে এখানে। কেন, কেন?

—এবার বৃষ্টিও হয়েছে খুব, কী বলো?

—হ্যাঁ। আত্মবিস্মৃতের মতো জবাব দেয় সে। আর কী বলবে।

—সেটাই হয়েছে মুশকিল আরও। সবজি টবজি যা লাগানো হয়েছে, সব ভাল ফলন দিয়েছে এবার। অন্যবারের থেকেও ভাল।

—তাতে মুশকিলের কী আছে? দেবযানী হঠাৎ খেয়াল করে কথাটা।

—বাঃ মুশকিল নয়? সেগুলো কার ভোগে লাগবে একবার ভেবেছ। আমাদের লাভটা কী হবে?

—ও, আচ্ছা। দেবযানী এবার ধরতে পারে মুশকিলের কারণটা

অনুপমের।

সেও ভাবছে তার মতো করে। কার হাতে চলে যাচ্ছে এসব। তার পরিশ্রমের সমস্ত ফসল? সত্যি মেনে নেওয়া খুবই শক্ত এটা। হয়তো এ বাগানে সেও আর আসবে না কোনও দিন।

দুঃখ হয় মনে কথাটা শুনে। কিন্তু কোনও জবাব দেয় না দেবযানী। বিষন্ন উদাস দৃষ্টি মেলে তেমনি এগিয়ে চলে···

শেষ শীতের অলস দুপুর যেন ঝিম ধরে আছে বাগানে। যতোদূর দেখা যায় শুধু সবুজ রঙ। ফিকে, হলুদ, ঘন, নানা ধরনের সবুজ। ওপরে বিশাল আকাশ, মেঘের কণামাত্র নেই কোথাও। খাঁ খাঁ উদাসীন নীল শূন্য। তাকালে বড় অসহায় আর একা লাগে নিজেকে।

—এদিকে দেখ, চলতে চলতে থামল অনুপম।

—কী? দেবযানী ফিরে তাকাল।

—বাঁধাকপির চেহারা দেখ একবার।

পাশের খেতে সুন্দর বাঁধাকপির চাষ হয়েছে। টাটকা সতেজ পাতাগুলোর মাথায় ঘাস ফড়িং আর পতঙ্গের দল উড়ছে দল বেঁধে।

—ভাল লাগছে না?

—হ্যাঁ, খুব ভাল। দেবযানী মাথা হেলায়। তোমার হাতের গুণ।

—আমার একার নয়, মল্লিদাও আছে। মাটিটা খুব ভাল তৈরী করেছে।

—তাহলে তোমাদের দুজনের হাতের গুণ।

—না না, আসলে জাতটাই খুব ভাল। দেখছ না, কী দারুণ ঘন হয়ে বুনোট বেঁধেছে পাতাগুলো। একেবারে টাইট খোঁপার মতো এক একটা। চাঁটি মারলে ঠাঁই ঠাঁই করে উঠবে।

দেখতে দেখতে নিজের মনে হাসল দেবযানী। কপিরা খোঁপা বাঁধছে ক্ষেতের মধ্যে বসে। কী অদ্ভুত কল্পনা অনুপমের!

বলল, তুমি চাঁটি মেরে দেখো নাকি খোঁপাগুলো?

অনুপম হাসল, আমি না। মল্লিদা মেরে মেরে দেখায় ব্যাপারীদের। শব্দ শুনেই পছন্দ করে ওরা।

—তাই! দেবযানীও হাসে কথাটা শুনে।

খানিকটা দূর এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে অনুপম। সামনে আলুর চাষ হয়েছে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে নিজেই।

বলল, ঝিনিদি দেখো। কী সুন্দর লাগছে।

দেবযানী দেখতে থাকে নরম সবুজ গাছগুলো কী ভাবে সার বেঁধে মাথা তুলছে আকাশে। ঢেউ তোলা মাটির ওপর ধাপ ধাপ করে সাজানো সতেজ গাছগুলো। হাওয়ার মধ্যে দুলছে কচি পাতাগুলো তির তির করে। হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে যেন।

অনুপমের গলায় আবেগ। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে থাকে, কী আশ্চর্য দেখ, এইবারই এটা আমরা প্রথম লাগিয়েছি। আমিই জোর করে। মল্লিদা বলেছিল হবে না, এই মাটিতে নাকি আলু হবে না ভাল। আমি বলেছিলাম আলবাৎ হবে। আমি করেই ছাড়ব। এখন দেখ—

—তাই তো, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে।

—আমাদের বাগানের প্রথম ফসল। এখনও তো আমাদেরই, তুমি নিজের হাতে দুটো তোলো, ঝিনিদি। উদ্বোধন হোক তোমার হাতে। প্লিজ—

হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে অনুপম।

দেখাদেখি তাকেও বসতে হয়। সোঁদা গন্ধ পায় নরম ভিজে মাটির। কচি সবুজ মখমলের মতো পাতাগুলো কাঁপছে। কালচে ধূসর ধুলো মাটির জমাট বাঁধা ঢেউ। একবার কান পেতে দেখতে ইচ্ছে করে। এখনও কি সেই ঢিব্‌ঢাব্‌ শব্দটা বাজছে ভিতরে। প্রথম দিন যেমন শুনেছিল।

বুকের মধ্যেই নিজের যেন তার প্রতিধ্বনি শুনতে পেল দেবযানী। মৃদু চাপা নিঃশ্বাস পড়ে একটা।

—কই ঝিনিদি, তুলে আনো।

অনুপমের কথামতো মাটিতে হাত ঢুকিয়ে দিল আস্তে আস্তে। অদ্ভুত লাগে শিকড়ের তলায় আলুর দানাগুলো স্পর্শ করতে। এক নরম উষ্ণ অনুভূতি। যেন ভাপ উঠে আসছে জীবনের। সদ্য

বেরিয়ে আসা দানাগুলোর সঙ্গে এক মুঠো মাটি। নতুন জন্ম নেওয়া ফসলের উম্। এখনও বড় কচি, সময় লাগবে বড় হয়ে উঠতে।

—পাচ্ছ না একটাও? আমি খুঁজে দেব।

—না, এই তো পেয়েছি।

আঙুলে জড়িয়ে বেশ বড়সড় একটাকে তুলে আনল ওপরে। মসৃণ মাটি ভরা সুডৌল। নরম মিষ্টি গন্ধ পায় নতুন আলুর।

অনুপ হাত বাড়িয়ে ধরল খুশি হয়ে, বাঃ চমৎকার।

মুখটা যেন চকচক করে ওঠে ওর। ভাল লাগে দেবযানীর।

—আরও, আরও কয়েকটা তুলে নাও ঝিনিদি। এখনও তো তোমার। তোমার নিজের ক্ষেতের প্রথম ফসল। এর স্বাদই আলাদা। ভাতে দিয়ে খাবে তুমি।

মাখন আর আলুসেদ্ধ বরাবর বড় প্রিয় ছিল সুমনের। হয়তো কথাটা মনে রেখেছে অনুপম!

এবার সে নিজেই হাত লাগাল। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে দু হাত ডুবিয়ে দেয় মাটির মধ্যে। পরপর তুলে আনতে থাকে মাটি মাখা তাজা নতুন ফসল তার।

দেবযানী হাত তুলে বসে থাকে। মুগ্ধ চোখে দেখে সেই ঢেউ তোলা কচি কচি গাছগুলোর দিকে। ফুরফুরে হাওয়ায় দুলছে। সুমনের নিঃশ্বাস মিশে আছে এই হাওয়ায়। এই আকাশে!

আর কেউ কোনদিন নাগাল পাবে না যার। একটানা রি রি করে কী এক পতঙ্গ ডেকে চলেছে জঙ্গলে। ডেকে ডেকে যেন সে এই কথাটাই ঘোষণা করে চলেছে···

খামার বাড়িতে পেঁছে জানা গেল। সদানন্দবাবু এখনও আসেন নি।

—সে কি! তাহলে?

—আর আসবেন বলে মনে হয় না। সময় পেরিয়ে গেছে।

মুরলী বিড় বিড় করে বলল। সে একবার লোকও পাঠিয়েছিল খেয়াঘাটে হারানবাবুর কাছে। বলতে পারলেন না তিনি কিছু। সেও অনেকক্ষণ হয়ে গেল।

পেয়ারা গাছের নীচে ধনুকের মতো বেঁকে বসেছিল মুরলী। মেদহীন কুচকুচে কালো শরীরটা বেঁকিয়ে একটুকরো ছোট্ট আয়নায় পরম নিশ্চিন্ত মনে দাড়ি কামাচ্ছিল। হাতে ধরা একফালি ভাঙা ব্লেড। তাই দিয়েই হাতের আন্দাজে সুন্দর মসৃণ করে দাড়ি চাঁছে সে। আয়নাটা উপলক্ষ মাত্র।

তাদের আসতে দেখেই চটপট উঠে দাঁড়াল। বিষণ্ণ মুখে মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে দেবযানীকে।

ঘর থেকে তাড়াতাড়ি দুখানা টুল এনে রাখল সামনে।

অনুপম বলল, মুল্লিদা কবে আসবেন তাহলে ভদ্রলোক? খবর টবর দিয়ে শেষে এইরকম—

—কবে আসেন এখন…

কথাটা শেষ হয় না। এটাই মুরলীর বিশেষত্ব। আধখানা কথা মুখেই থেকে যায়। বুঝে নিতে হবে বাকিটা অনুমানে। অর্থাৎ এখন পুরোপুরি অনিশ্চিত সদানন্দবাবুর আসা।

—যাঃ বাব্বা! বেশ লোক তো! মিছিমিছি এরকম হয়রান করে মানুষকে।

খুব হতাশ ভঙ্গি করে তার দিকে তাকায় অনুপম। কিন্তু গলার স্বরে স্বস্তির ভাবটা লুকোতে পারল না।

—দেখলে ঝিনিদি, লোকটার কাণ্ডটা?

দেবযানীরও যেন হঠাৎ হালকা লাগে মনটা। জানে এতে কিছুই এসে যায় না। তবুও।

বলল, একটা বিপদটিপদও তো হতে পারে। হয়তো বা কোথাও আটকে পড়েছেন।

—হ্যাঁ, হতেও পারে। আর দুদিন দেরি হলেই বা আমাদের এমন কী, বল?

—একেবারে না এলেই বা কী? দেবযানী মৃদু হাসে অনুপের নিশ্চিত ভঙ্গিটা দেখে।

—যা বলেছ। হাসিভরা মুখে সঙ্গে সঙ্গেই সায় দিল সে।

নিশ্চিন্ত মনে এবার নেশার মতো ঘুরতে থাকে দুজনে। যে দিকে দুচোখ যায়। শীতের নরম রোদের মধ্যে টই টই করে যেন

চষে বেড়ায় বাগানটা।

দেবযানী আজ আর একটুও বসবে না। শুধুই ঘুরবে। এই বনভূমি যেন অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। নিঃশব্দে কিছু বলতেও চায় তাকে বারবার। হয়তো ধরতে পারে না ঠিকমতো।

আম বাগানটা ছাড়িয়েই চোখে পড়ে সামনের মাঠটা ফুলে ভরা। হাওয়ার মধ্যে দোল খেয়ে চলেছে কুচি কুচি অজস্র সাদা আর বেগুনি ফুল। এদিকে মটরশুঁটির চাষ হয়েছে এবার। চোখ জুড়োনো দৃশ্য একটা। পর্যাপ্ত ফলনে ঘন সবুজ হয়ে ফুলে উঠেছে ক্ষেতটা। রঙিন প্রজাপতির দল ঘুরছে ওপরে ঝাঁক বেঁধে। অসংখ্য ছোট ছোট পাখি তারও ওপর দিয়ে আনন্দে উল্লাসে হুটোপাটি খেয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে পর পর দুটো পালতে মাদার। আগুন ভরা ফুলের ঝাড় নিয়ে দাঁড়িয়ে···

সুমন বলত, পারিজাত! এরাই নন্দনের পারিজাত। দেখে নাও—এই তোমার বাগানেই ফোটে!

এখন তারাই ভরে উঠেছে টকটকে লাল ফুলের শিখায়। মাথা দোলাচ্ছে চোখের সামনে। দেখতে দেখতে চোখে ধাঁধা লাগে দেবীর···

অনুপম কোথায় হেঁটে যাচ্ছে দূরে! প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছে। পাখি দেখছে হয়তো নতুন কোনও জাতের। সুমনের পুলওভার পরা অনুপম। শরীরের রেখাটা হঠাৎ যেন কেমন লাগে! তারই মতো এগিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে আকাশের গায়ে। মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে···

ঝাপসা চোখ দুটো অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয় দেবযানী। ভারি দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে একটা।

ভাবে সুমনের আত্মা যদি কোথাও থেকে থাকে, তা এখানেই। পায়ের কাছে লেজ তুলে, টিরিক্ টিরিক্ ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসছে যে পাখিটা, তার মধ্যেও। হয়তো এমনি করেই তাকে বলছে, ছি দেবী, ছিঃ! এত দুঃখ কেন তোমার? এমন চাপা দুঃখ!

দেবযানী মনে মনে উত্তর দেয়, এটা ছাড়া আমি কী করে থাকব সুমন? আর কী আছে আমার? এই তো সম্বল এখন। শুধু বুক ভরা দুঃখের ভার। আমার একার দুঃখ শুধু!

দুঃখ না ভয় ? এভাবে কি বাঁচা যায় দেবী ? বেঁচে থেকেই বা কী লাভ ? ছিঃ দেবী···

কী বলতে চাও তুমি সুমন ··

সারা শরীর যেন দুলতে থাকে দেবযানীর। বুকের মধ্যে হাজারটা ঝিঁঝি পোকার ডাক এক সঙ্গে। ঘন রোদ্দুর ভরা জমিটা কুয়াশার জট পাকিয়ে যেন ঠেলে উঠছে মাথা উঁচু করে। বিন্দু বিন্দু অদ্ভুত আলোর কণা। যেন এক অলৌকিক দৃশ্য! স্বপ্নের মতো। তার মধ্যে সুমন্ত্রের মুখ। একবার ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে ঝাপসা হয়ে!···

—ঝিনিদি, ঝিনিদি-ই—।

অনুপম কখন ফিরে এসেছে হঠাৎ। ডাকছে তার পাশে দাঁড়িয়েই।

চমক ভেঙ্গে দেবী ফিরে তাকাল।

রোদ ঝলসানো মুখে সে হাসছে। দু হাত ভর্তি মটরশুঁটি। সোয়েটারের নীচে প্যান্টের পকেট দুটোও কড়াইশুঁটিতে ফুলে উঠেছে। পাগল ছেলে!

হাসিমুখে এক মুঠো বাড়িয়ে ধরল তার দিকে, নাও, ঝিনিদি। খেয়ে দেখ, খুব মিষ্টি।

দেবযানীও মৃদু হেসে হাত পেতে দেয়।

—এখানে বসেই খেতে সবচেয়ে ভাল লাগে এগুলো। ক্ষেতের মধ্যে বসে ছিঁড়বে আর খাবে। তার টেস্টই আলাদা।

—এতক্ষণ খাচ্ছিলে বুঝি ?

—খাব না ? সদানন্দবাবু এসে কবজা করার আগে যতটা পারি খেয়ে নি আমরা। তুলেও নিয়ে যাব যাবার সময়, কি বলো ?

মজা করে হাসল অনুপম।

হাতভর্তি কাঁচ কড়াইশুঁটিগুলোর টাটকা গন্ধ নিতে নিতে দেবযানীও হাসল সঙ্গে। বলল, বেশ তো, নিয়ে যেও তোমার পছন্দের জিনিস।

সামনেই একদল সবুজ পাখি উড়ছে ঘুরে ঘুরে। সুন্দর দেখতে পাখিগুলো।

অনুপম সেদিকে দেখিয়ে বলল, ওদেরও খুব আনন্দ হচ্ছে ক্ষেতটা পেয়ে। প্রচুর পোকার আমদানি হয়েছে চারদিকে। পোকা, ফড়িং, মথ...

—ওগুলোর নাম কী অনুপ? দেবযানী বলল।

—ওদের বলে বাঁশপাতি। বী-ইটার। মটর খেতের পোকা, ফড়িং সব ধরে ধরে খাচ্ছে।

—ইস্!

—ইস্ কী? এটাই তো ওদের খাদ্য। আমরা খাই না? অনুপম হাসল।

দেবযানী উত্তর দেয় না। দাঁতে কেটে মটরদানা ছাড়াতে ছাড়াতে একমনে দেখতে থাকে পাখিগুলোকে। রোদ্দুরের মধ্যে সবুজ বাঁশপাতার মতোই ঝিলিক কেটে উড়ছে। ডাকছে ঘন ঘন। লেজের দিকে যেন সরু একটা ছুঁচ ফোটানো। আকাশ থেকে ঝাঁপ কেটে নেমে আসছে সামনে।

—তোমার ঘরের দিকটাও খুব পাখি এসেছে। প্রচুর বেনে বউ দেখতে পাবে। আমগাছে বউল এসেছে না? দেবযানী কটেজের কাছেই যে বড় গাছটা। পোকার লোভে আর মধু খেতে প্রচুর পাখিদের ভিড় এখন! যাবে দেখতে?

'দেবযানী কটেজ'। সেই ছবির মতো বাড়িটা! এখন প্রায় পোড়ো বাড়ির চেহারা। বন্ধই হয়ে আছে অনেকদিন। অনুপম এখনও বলে তোমার ঘর। অথচ সে কতদিন আসে নি! কাছে গিয়ে আজ একবার দেখতে ইচ্ছে হয় খুব। সেই মাতাল জ্যোৎস্না রাত! তার স্মৃতি নিয়ে বাড়িটা এখনও কেমন দাঁড়িয়ে আছে!

বলল, চলো যাই, অনুপ।

কয়েক পা এগোতেই গোয়ালঘর থেকে গরুর ডাক।

দয়া ডাকছে, হাম্বা। হাম্বা-মা-আ-।

করুণ ডাকটা শুনে যেন মায়া হয়। কাঁপা কাঁপা গলায় ডেকেই চলেছে দয়া। তাকে দেখে কি?

কাজলের মেয়ে দয়া। ভাল জাতের হরিয়ানার গোরু। কোথা থেকে যেন পছন্দ করে কিনে নিয়ে এসেছিল সুমন্ত্র। চোখের নীচে

গাঢ় কালচে ছাপ দেখে দেবীই নাম রেখেছিল কাজল। বেশিদিন বাঁচে নি কাজল। তার মেয়ে দয়াও রোগজীর্ণ শরীরটা নিয়ে এখন ধুঁকছে।

মায়ের রোগটা ওকেও ধরেছে। হয়তো দয়ারও আর বেশি দিন নেই।

একদৃষ্টিতে তাদের দেখছে দয়া। আর করুণ স্বরে ডাকছে। একবার যেতেই হয় কাছে।

কাছে গিয়ে দেবযানী একটু আদর করে দয়াকে। থলথলে গলায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয়।

গলাটা আরও লম্বা করে বাড়িয়ে দিল দয়া। ডাগর চোখ দুটো ছলছলে। দু ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল যেন।

দেবযানী মুখটা ধরে বিড়বিড় করে ডাকল, দয়া। দয়া—কী হয়েছে?

গোরুটা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। ছলছলে চোখে সেই এক বোবা দৃষ্টি মেলে দেখতে থাকে দেবযানীকে।

খুব চাপা স্বরে প্রায় ফিস ফিস করে তাকে ডাকছে অনুপম।

—ঝিনিদি, ঝিনিদি। একবার এসো এদিকে, খুব তাড়াতাড়ি।

দেবযানী ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যায়।

একটা ঝোপের আড়ালে উঁকি মেরে চুপি চুপি কি দেখছে অনুপ। কাছে যেতেই তার হাত ধরে বসিয়ে দেয়, একদম নড়বে না।

—কেন?

—চুপ। ব্রেইন ফিবার। বলে সেও বসে পড়ল।

—সেটা আবার কি? দেবযানীও ফিস ফিস করে বলে। ছেলেমানুষী উত্তেজনাটা অনুপের, তাকেও পেয়ে বসেছে যেন।

অনুপ একমনে ঝোপের মধ্যে দেখতে দেখতে বলল, পাখি। ভীষণ লাজুক ওরা। মানুষ দেখলেই পালায়। কখনও সামনে আসতে চায় না। ভেরি রেয়ার বার্ড। এখান থেকেই দেখো তুমি—।

দেবযানী অনড়। অনুপমের পিঠ চওড়া দেয়ালের মতো আড়াল

করে আছে তাকে। হাতটা ওপরে তোলা।

নিঃশ্বাসের সঙ্গে সবুজ পুলওভারটা দুলছে। তাকে আটকাতে অনুপ প্রায় মুখের ওপর চেপে ধরেছে হাতটা। না, সেই গন্ধটা আর নেই। তার বদলে এক তাজা উষ্ণ আর বন্য গন্ধের ঝলক। কেমন অন্যরকম লাগে…

দেবযানী কিছুতেই সেই ঘ্রাণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারছে না। এখনও শক্ত করে হাতটা চেপেই আছে অনুপম। আর গোপন কথা বলার মতো কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলে চলেছে, আসলে এরা হল সেই পিউ কাঁহা। তুমি শোন নি এদের ডাক? একেবারে মাতাল হয়ে ডাকে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি।

—চোখ গেলও বলে এদের। মনে মনে বলছে, 'চোওখ গে-ল—'।

—ও।

—ইংরেজরা আবার এটা শোনে, 'ব্রেইন ফিবার!' নামটা জানলে তোমারও মনে হবে।

—কেন?

—তাই হয়। যে নামটা তোমার মনে আছে, সেটাই শুনবে। যেমন মারাঠিরা একে বলে 'পাওস আলা'। মানে বৃষ্টি আসছে।

—বাঃ ভারি অদ্ভুত তো।

—অদ্ভুত না অদ্ভুত। আরও অনেক নাম আছে এর। এত সুন্দর সুর শোনায় বলে, নামের কোনও অন্ত নেই।

—তুমি সব নামগুলো জান?

—মোটামুটি। আসলে বার্ডওয়াচাররা একে বলে ইক্‌কুকু। কোকিলেরই একটা জাত এরা। কিন্তু রঙটা দেখ, কেমন ছাইছাই আর বাদামি।

—তাই?

—হ্যাঁ এইবার, এইবার মুখ ফেরাচ্ছে…চোখটার দিকে দেখ একবার, কেমন মাতাল আর উড়ো উড়ো ভাব…আসলে কিন্তু খুব চালাক। শিকার ধরতেও তেমনি ওস্তাদ…

গন্ধটা ক্রমশ আরও তীব্র এবার। দেবযানী কিছুই দেখে না।

আচ্ছন্নের মতো শুধু উচ্চারণ করে, ও···

—লোকে ভাবে পিউ কাঁহা বুঝি খুব প্রেমিক পাখি। এমন সুন্দর ডাকে! আসলে তো খুদে খুদে বাজপাখি সব। সেই জন্যেই তো আসল নাম, হক্ কুকু। চঞ্চুটা লক্ষ করেছ, ঠিক বাজ-পাখির মতোই বাঁকানো···তুমি দেখতে পাচ্ছ তো ঠিক, ঝিনিদি।

মুখ না ফিরিয়েই প্রশ্ন করল অনুপ।

ফিরলে দেখত, দেবযানীর চোখে মুখে এক অন্যরকম যন্ত্রণার ছবি। যেন নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করছে বসে। আর কোনও দিকে দৃষ্টি নেই তার। দেখতে চেষ্টাও করে না কিছু।

তবুও হঠাৎ বলে উঠল, কই কোথায়?

—আরে আরে! উত্তেজিত অনুপ তাকে একটানে আবার বসিয়ে দেয় পাশে, উঠছ কেন? পালিয়ে যাবে যে। আমার সঙ্গে দেখ, ওই যে, ওই ওপরে ডানদিকের লম্বা ডালটার দিকে সোজা তাকাও—ঢেউ খেলানো জায়গাটায়, দেখতে পেয়েছ?

উত্তেজিত অনুপম আরও সরে আসে কাছে।

অগত্যা বাধ্য মেয়ের মতো তার হাতটা অনুসরণ করে তাকায় দেবযানী। ঝলকে ঝলকে আগুন নিঃশ্বাসের ছোঁয়া। তার মধ্যেই হঠাৎ দেখতে পেল ছোট্ট পাখিটাকে। পাতার সঙ্গে মিশে আড়ালে বসে আছে। তার মতোই যেন কাঁপছে সেখানে তিরতির করে। লেজটা নড়ছে, মুখটা পাশে ফেরানো—আবছা রঙ···

উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ, এইবার দেখতে পেয়েছি। ওই তো—

বলেই হাত তুলল দেবযানী। আর সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে পালাল পাখিটা।

—যাঃ গেল। দিলে তো উড়িয়ে তুমি?

—বারে! আমি ওড়ালাম?

—তবে কে?

ও তো নিজেই উড়ল।

—তুমি ঝট্ করে হাত দেখাতে গেলে কেন? নাহ্! আর পাওয়া যাবে না ওকে।

হতাশায় মুষড়ে পড়ে অনুপম। একটু রেগেও গেল যেন।

দেবযানীর হাসি পায় মুখটা দেখে।

বলল, বাঃ তুমিই তো বলছিলে একটু আগে, ভীষণ লাজুক ওরা। মানুষ দেখলেই নাকি পালায়, তবে?

অনুপ উত্তর দেয় না। মুখটা সেই গম্ভীর।

মৃদু হেসে ওর পিঠে হাত রাখে দেবযানী, ঠিক আছে। আর হবে না। আমি নড়বই না, কথাও বলব না। চলো এবার ওপাশে গিয়ে দেখি। ওখানেও অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি আসে, সেবারে দেখেছিলাম—

অনুপম কোনও খেয়াল করে না তার কথার। উঠে দাঁড়িয়ে এক মনে লক্ষ করতে শুরু করেছে, কোথায় গেল সেই পাখিটা। দেবদারু জঙ্গলের দিকেই নজর বিশেষ করে।

দেবযানী কটেজের কথা ভুলে গিয়ে এখন ছেলে মানুষের মতো পাখিটার পিছনেই ধাওয়া করতে থাকে।

দেবী একা একাই সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। হাওয়া উঠেছে। প্রথম বসন্তের হাওয়া। সুন্দর শব্দের গুঞ্জন বাজে চারদিকে। মৌমাছির দল এসে পড়েছে আমবাগানে। কাঁচ রউল ফোটা গাছের ম-ম করা গন্ধ। কতদূর থেকে এই ঘ্রাণ তাকে এসে স্পর্শ করে যেন! অভিভূত হয়ে পড়ে সে। হাত পা অসাড়।

তবু অন্যমনস্ক একা দেবযানী ধীরে ধীরে পা বাড়াল সেই কটেজের দিকেই।

১১

সীমানা ঘেরা বাংলো বাড়িটার চারদিকে এখন আগাছার জঙ্গল। বুনো লতার ঝাড় চালের ওপরই লতিয়ে উঠেছে। জানলার পাশে ধুঁধুল লতা। হাওয়ার সঙ্গে দোল খেয়ে চলেছে বুনো ধুঁধুলের সারি। কেউ নজর করে না হয়তো এখন। বনভূমি দুহাত বাড়িয়ে তার নিজের মতো করে সাজিয়ে নিচ্ছে বাড়িটাকে। একদিন পুরোটাই হয়তো নিয়ে নেবে।

দেবযানী হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে গভীর নিঃশ্বাস নেয় বারবার। দেখে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। বুলবুলি উড়ে গেল এক ঝাঁক কলরব করতে করতে। একটা টিয়া মুখ ঘষছে তার হলুদ পায়ে।

মাত্র কটা বছর, তার মধ্যেই এমনি করে হারিয়ে গেল সব! ভাবতে পারে না দেবযানী। ঘরের পিছনেই একটা ঘুঘু ডাকছে কোথায়। একটানা বিষণ্ণ গলা। নিস্তব্ধ এই পরিবেশে সুরটা যেন তার বুকের মধ্যেই গুমরে গুমরে উঠছে। গ্রু-গ্রু—গ্রু!

সেই সব দিনগুলো, রাতগুলো আর নেই! গ্রু-গ্রু—গ্রু!

অথচ মনের মধ্যে ছবিগুলো যে জ্বলজ্বল করে এখনও। রাত্তিরে স্বপ্নের মধ্যে ধরা দেয়। আজও চারদিক থেকে ঘিরে আছে তাকে। কেউ ছাড়িয়ে নিতে পারবে না তার হাত।

গ্রু-গ্রু—গ্রু! আবার একটা ভারি নিঃশ্বাস পড়ে দেবীর!

দেবযানী কটেজ। অনুপমের সুন্দর করে লেখা সেই ফলকটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে! নীল হলুদ রঙটা জ্বলে গিয়ে বিবর্ণ। এইবার খসেই পড়বে একদিন। সিঁড়ির ওপর সেই সাজানো টবগুলো আর নেই। সব মিলিয়ে কেমন থমথমে আর বিমর্ষ চেহারা। গ্রু-গ্রু—গ্রু— !

পায়ে পায়ে আরও একটু এগিয়ে আসে দেবযানী। অনুপমের জন্যে অপেক্ষা করে খানিক। এখনও তার দেখা নেই। কোথায় চলে গেল, কে জানে।

তার সামনে মুখোমুখি নির্জন বাড়িটা। চুপচাপ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। দরজা জানলাগুলো খুব শক্তভাবে এঁটে বন্ধ করা। গৃহস্বামী ঘর ছেড়ে চলে গেছে যেন বহুদিন! বাতাস বয়ে চলেছে প্রাঙ্গণে শন্‌শন্‌ শব্দ করে। ফুল্ল শিরীষ এখানে নেই। কুন্দ কামিনীর ঝাড় আছে। মাথা দোলাচ্ছে তাদের ফুলের ঝালর। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করে না, এসেছে কি? সে কি আসে?

প্রশ্নটা যেন নিজের বুকের মধ্যেই গুন্‌গুন্‌ করে দেবযানীর।

অথচ বাইরে বিস্তৃত বিশাল বনভূমির কোনও খেয়ালই নেই এদিকে। ক্ষুদ্র এই পরিসরটুকুর দিকে। ফল ফুল নিয়ে চারদিক

থেকে দাপিয়ে উঠছে সে তার বন্য চেহারায়। অনুপের লাগানো সেই ছোট ছোট বুন্দ গাছগুলো এখন রীতিমতো তেজী আর ঝাঁকড়া। ঝিলমিল করে কাঁপছে অজস্র ফুলের সাজ নিয়ে আকাশে। মাটিতেও ছড়িয়ে দিয়েছে অজস্র। সঙ্গে সদ্য গজিয়ে ওঠা লকলকে আগাছার জঙ্গলগুলো। তারাও মাথা দুলিয়ে নাচছে সমানে হা-হা হাওয়ায়। কোমর দুলিয়ে নুয়ে পড়ল নবীন দেবদারু। দেবযানীকে হঠাৎ দেখেই যেন অভ্যর্থনা করছে তারা সবাই মিলে।

পিছনে আমগাছটার দিকেও নজর করে দেবযানী। অজস্র বউল-মুকুলে ছেয়ে গেছে গাছের মাথা। কাঁচ কাঁচ সবুজ ফুলের টোপর। নেশার মতো টানে যেন দৃশ্যটা। ঝাঁক বেঁধে মৌমাছি উড়ছে। তাদের গুন গুন-ঝিনঝিন! কিছু কি দেখতে পায় সে? ওই বনস্পতির আড়ালে, পাতার মধ্যে, কোনও অস্পষ্ট মুখের ছবি? যে স্থির দৃষ্টিতে তাকেও লক্ষ করে চলেছে এই মুহূর্তে! বুকের মধ্যে ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে দেবীর! সে কি আসে!

নাহ্‌! ছবিটা ফুটেও যেন ফুটল না। রেখাগুলো মিলিয়ে গেল আড়ালে।

আবার দমকা হাওয়া বইল। ঝিরঝির শব্দের মধ্যে মৌমাছিরা উড়ে যায় দোল খেয়ে। ডালপালা দুলিয়ে নেচে উঠল গাছটা। জানলার ওপর ফুল ফোটা ধুঁধুল লতার হুটোপাটি। এক ঝাঁক বনটিয়া উড়ে এল চারদিকে সাড়া ফেলে।

দেবযানী অবাক! কী হয়ে গেল যেন হঠাৎ এই মুহূর্তে! এক অদ্ভুত উল্লাসে ডাক ছেড়ে উঠল জঙ্গলটা। কোথাও কোনও দুঃখের লেশমাত্র নেই। তাদের মধুযামিনীর নির্জন বাড়িটা ঘিরেই ফুল, পাখি, পতঙ্গদের এখন জমজমাট বসন্ত উৎসব।

গেটটা সরিয়ে আস্তে আস্তে ভিতরে এসে দাঁড়াল সে।

পাখিটাকে আর পাওয়া গেল না। অনেক খুঁজল।

বাগানের মধ্যে ঢুকেও কোনও হদিশ করতে পারল না অনুপম। অবশেষে চুপচাপ দেবযানীর পাশে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

মুখটা গম্ভীর। মাথা নামিয়ে নিজের মনে কী ভাবছে।

দেবযানী একটু তাকিয়ে বলল, কী হল, অনুপ।

—কিছু না।

—কতদূর চলে গিয়েছিলে?

—এই তো কাছেই।

—আমার ওপরে রাগ? দেবযানী ভুরু বাঁকাল।

—যাঃ, কী বলছ তুমি! রাগ কেন হবে?

—কী জানি, হতেও তো পারে। দেবযানী এক কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—কক্ষনো না। হতেই পারে না। তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে এবার।

দেবযানী উপভোগ করে ভঙ্গিটা।

পরে বলল, চলো একবার বাড়ির ভিতরটা দেখি। ঘরগুলো এমন বন্ধ করে রেখেছ কেন তোমরা? বাইরে এমন সুন্দর হাওয়া। খুলে দাও না সব, হাওয়া খেলুক।

দেবযানী পা বাড়াতেই এবার বাধা দেয় অনুপম, না, ঝিনিদি না, যেয়ো না এখন—

—কেন বল তো? গেলে কী হয়েছে?

—ময়লা জমে আছে। সাপকোপ কত কী থাকতে পারে। কতদিন ধরে বন্ধ, কী দরকার?

—জানি না কী দরকার। তবুও একবার যেতে হবে। দূর থেকেই দেখব আমি। তুমি চলো।

কোনও বাধাই মানল না দেবযানী। তাকে নিয়েই এগিয়ে চলল। একবার নিজের চোখে দেখবে তাদের ঘরটা। তার আসবাব পত্তর। স্মৃতিচিহ্ন ভরা টুকিটাকি। হয়তো এই শেষবার!

—প্লিজ, দরজাটা একটু খুলে দাও অনুপ। ভীষণ শক্ত লাগছে এটা।

দেবযানীকে সামলানো গেল না। অগত্যা এগিয়ে আসে অনুপ। মরচে পড়া ছিটকিনিটা ধরে টানাটানি করে খুলে ফেলল দরজাটা অবশেষে।

অদ্ভুত একটা শব্দ উঠল বন্ধ দরজা খোলার। ভ্যাপসা গুমোট

গন্ধ। ভিতরে অন্ধকার। একটু একটু করে পাতলা হয়ে আসছে।

দেবযানী কোনও কথা বলে না। ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে সেই অন্ধকারের দিকে।

—দেখছ, ভেতরের অবস্থাটা! কোথায় পা দেবে এর মধ্যে বলো?

দেবযানী নিরুত্তর। একমনে দেখেই চলেছে মগ্ন দৃষ্টিতে…

এই সেই ঘর! সকাল হলেই জানালায় এসে পাখি ডাকত। ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙাত তার। কথা বলত অদ্ভুত ভাষায়। এখন সেখানে আলো নেই। চারিদিকে ডাঁই হয়ে নোংরা আবর্জনার স্তূপ। খাটের ওপর পুরু ধুলো ময়লার আস্তরণ। সব কিছুই ঢাকা পড়ে আছে তার তলায়। এমনিই থাকবে বরাবর। সদানন্দ-বাবুরা যখন ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেবে বাড়িটা! তখনও কোথাও ঠিক থেকে যাবে। বাগানভরা এই উল্লাস আর হাওয়ার মধ্যে।

খাটের নীচে অন্ধকারে সুমন্ত্রর সেই ভারি গামবুট। পরিষ্কার ফুটে উঠছে। অনেকদিন আর ব্যবহার হয়নি। দেয়ালে পর পর দুটো তালপাতার রঙিন সান হ্যাট। তার আর সুমন্ত্রর। ছবি তুলেছিল তার একটা, এই হ্যাট মাথায়। খাটের তলায় আরও একটা বাতিল সোলার টুপি সুমন্ত্রর। একগাদা যন্ত্রপাতি, কোদাল, শাবলের সঙ্গে পড়ে আছে…

দেখতে দেখতে যেন ঝিমঝিম করে আসে মাথাটা। অন্ধকারের জমাট বাঁধা একটা ঘোর চোখের সামনে। দুলছে। তার মধ্যে আবার সেই মুখের আদলটা যেন! দেখছে এক দৃষ্টিতে তাকে। নাহ্ অসম্ভব!

চোখ ফিরিয়ে নিল দেবযানী।

বাইরে তখন এক অন্য ছবি। উৎসব লেগেছে যেন। প্রথম বসন্তের দমকা হাওয়া বনভূমিতে। পাখিদের ডাকে এক গমগমে উল্লাস। কোথাও কোনও অন্ধকারের চিহ্ন নেই। শোকেরও নয়। সামনেই সেই গাছটা। ঠিক চিনতে পারে। বড় হয়ে গেছে অনেক, তবু চেনা যায়!

ওর পাশেই তাদের সেই আশ্চর্য রাত কেটেছিল সেদিন! কোনও

ভুল নেই। ডালপালা ছড়িয়ে গাছটা দুলছে হাত বাড়িয়ে। সাদা থোকা থোকা ফুলগুলো মাথা নাড়ছে। তাকিয়ে থাকলে নেশা ধরে যায়। কেউ যেন ডাকছে তাকে···এসো দেবযানী···এসো দেবী··· এখানে এসো···চলে এসো কাছে···

অনুপ কোথা থেকে ডাল পাতা শুদ্ধ একটা সাদা গোলাপ তুলে নিয়ে এল। সবুজ পাতার মধ্যে টাটকা তাজা একটা ফুল।

বলল, এই নাও ঝিনিদি। এটা তোমার।

—কোথায় পেলে হঠাৎ?

—কলম বেঁধে ফুটিয়েছি, টবের মধ্যে।

—বাহ্, বেশ সুন্দর তো! তোমার হাতে যাদু আছে অনুপম।

এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দেবী। এই ফুলটাকেও কেমন অন্যরকম মনে হয়।

বলল, তুমি এটাকে ছিঁড়লে কেন অনুপ? গাছেই তো ভাল ছিল।

—কার জন্যে থাকবে?

—গাছের নিজের জন্যে। ম্লান হাসি দেবযানীর মুখে।

—মোটেই না। সদানন্দবাবুর দল এসে ছিঁড়বে তাহলে। তার চেয়ে এই ভাল। তুমিই মাথায় লাগাও এটা।

—আমি!

—কেন নেবে না? মুখটা করুণ অনুপমের।

—বেশ নিলাম। তাহলে সন্ধি? শ্বেত গোলাপের সন্ধি? হাসল দেবযানী, পাখিটাকে উড়িয়ে দিলাম বলে আর রাগ নেই তো।

লজ্জায় মুখ নামিয়ে নেয় অনুপম।

আবেশভরে ফুলটার গন্ধ নাকে টানে দেবযানী। আলতো হাত বোলায় পাপড়িতে। ঘ্রাণ নিয়ে বলে, আহ্! খুব সুন্দর গন্ধ!

অনুপম কেমন বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। ঘন দৃষ্টিতে যেন একটা বিষণ্ণতার আভা। দুঃখী দুঃখী মুখে বেচারি কী বলতে গিয়েও মুখ ফুটে বলতে পারছে না।

কিছুই বুঝতে পারে না দেবযানী। কেন এমন চেহারা হঠাৎ?

সে কি কোনও আঘাত দিয়েছে, না জেনে ?

—কী হল তোমার অনুপ ? অমন মুখ ভার করে আছ কেন ? এখনও রাগ যায়নি আমার ওপর ?

—কিছু না, এমনিই।

—আমার কাছে লুকিও না অনুপ। কী ভাবছ তুমি ? বলো আমাকে।

—বেশ। একটা কথা বলব, রাখবে ঝিনিদি ?

—কী আবার বলবে ? দেবযানী অবাক হয়ে তাকায়।

—বলছিলাম ঝিনিদি···এই বাগানটা নাই বা বিক্রি করলে। যেমন আছে থাক না···তুমি একবার জোর দিয়ে বললেই হবে। আমি সদানন্দবাবুকে খবর দিয়ে দেব। তাছাড়া আমাদের···

—কী বলছ তুমি অনুপ! আর কি হয় এখন!

—আমি কথা দিচ্ছি ঝিনিদি, আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। আমি···তোমার হয়েই সব দেখাশোনা করব। তুমি শুধু একটু জোর দিয়ে বলো মাসিমাকে···বুঝিয়ে বলো এছাড়া আর উপায় নেই।

কান্নার মতো একটুকরো হাসি দেবযানীর মুখে। চোখ দুটো টলটলে।

বলল, তাই কি আর হয় অনুপ! পাগল ছেলে! তোমার ভবিষ্যৎ আছে না। তুমি কত বড় হবে, কত জায়গায় ঘুরবে। তুমি কেন আটকা পড়ে থাকবে এই বাগানটা নিয়ে।

—আমি আর কোথাও যেতে চাই নে ঝিনিদি, গেলেও হয়তো থাকতে পারব না। এই সত্যি বলছি তোমাকে ছুঁয়ে, তুমি বিশ্বাস করো। এই বাগান আর খামারটাকেই আরও বড় করে তুলব—আরও অনেক বড়। সমুদা যেমনটা চেয়েছিল···

দেবযানীর মুখে যেন কথা সরে না। কী বলবে সে মুখের ওপর ছেলেটাকে। তার ছেলেমানুষী আবেগটা তাকেও দুর্বল করে ফেলে মুহূর্তে। ভাবে, ভাবতে থাকে অনেক কিছু—।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। অনুপমের দুচোখে গম্ভীর ভাবুক দৃষ্টি। তাকিয়ে আছে দূরে মাঠের দিকে।

ম্লান হেসে বলল, কিন্তু আমার জন্যে, তুমি এভাবে তোমার ভবিষ্যৎটা নষ্ট করবে অনুপ।

—শুধু তোমার জন্যে নয় ঝিনিদি। আমার জন্যেও। ভাবো না, এটাই ভবিষ্যৎ আমার।

গলায় আবেগ এসে যায় অনুপমের। চোখ দুটো চকচকে। সামলে নিল নিজেকে। তারপর একটু থেমে আবার বলল, এটাই যে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে - এই বাগানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে, এই পরিবেশের সঙ্গে। তুমি তো বরাবর জানো সে কথা, ঝিনিদি··· তাহলে কেন বলছ?

অনুপম সেই ভাবুক দৃষ্টি মেলে তাকায় তার দিকে। তাকিয়েই থাকে।

বুকের মধ্যে কাঁপে দেবযানীর। এটা কি সম্ভব? খুবই অসম্ভব কি? ঠিক জানে না। এই মুহূর্তে ঠিক ভেবে উঠতে পারে না। অথচ অনুপম উত্তরটা জানার জন্য উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে।

ভয় হয় দেবযানীর। অনুপমের এই ছেলেমানুষী আবেগটাকে প্রশ্রয় দিতে বড় ভয় হয়। এই ভয়টার কথাই কি শুনেছিল তখন সুমন্ত্রর মুখে।

সুমন তুমি কী চাও··· ?

বেলা গড়িয়ে গেল পশ্চিমে। সারা দুপুর ধরে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত লাগে এখন। তবুও থামে না। এভাবেই দিনটা আজ কাটিয়ে দেবে দেবযানী।

বহুদিন পর ঘরের বাইরে পা দিয়ে যেন এক নির্ভার মুক্তির স্বাদ পায় আজ। বনভূমির অবাধ বিস্তার নেশার মতো আকর্ষণ করে চলেছে তাকে। সঙ্গে উদ্দীপ্ত অনুপম। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত উত্তেজনা।

তৃষ্ণায় গলাটা শুকিয়ে কাঠ। হাঁপিয়েও পড়েছে বেশ। তবু বিশ্রাম নিতে মন চায় না। যতোদূর পারে সে এমনি নিরুদ্দেশ হয়ে ঘুরবে। ঘ্রাণ নেবে অরণ্যের। কথা শুনবে পাখিদের, গাছ-গাছালির।

পুকুরপাড়ে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অনুপ। সারি সারি নারকেল গাছ চারদিকে। জলের দিকে হেলে পড়ে ছায়ায় মুখ

দেখছে যেন নিজের নিজের। নিটোল সবুজ ডাবের কাঁদিতে ভরা গাছগুলো।

তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে বলল, ডাব খাবে, ঝিনিদি। খুব মিষ্টি জল কিন্তু এই ডাবগুলোর।

—বেশ তো। দেবযানী মাথা হেলায়, কিন্তু কে পাড়বে?

—দাঁড়াও না। আমি ব্যবস্থা করছি।

শেষ পর্যন্ত মুরলীকে ডেকে ব্যবস্থাটা হল।

সঙ্গে একটা লোক এনে দড়ি বেঁধে এক কাঁদি নামিয়ে আনল সে। ধারালো কাটারি দিয়ে ঝপঝপ মুখ ছাড়াতেও শুরু করে দিল।

অনুপ বলল, আমাকে দাও মুল্লিদা। অন্যরকম করে কাটতে হবে।

দেবযানী বলল, এতগুলো ডাব কে খাবে?

মুরলী হাসি হাসি মুখে তাকায় অনুপমের দিকে।

—হ্যাঁ মুল্লিদা, গোটা চার পাঁচ রেখে তুমি নিয়ে যাও বাকি-গুলো। যাও।

—আজ্ঞে, আমরা ছাড়িয়ে দিয়ে যাই।

—ঠিক আছে মুখটা উঁচুতে তুলে ছাড়িয়ে দিয়ে যাও। আমার কাছে ছুরি আছে। বাকিটা আমি করে নেব।

—আজ্ঞে, চারটে রাখি?

—হ্যাঁ তাই রাখ। দারুণ তেষ্টা পেয়েছে।

—তাই বলে চারটে লাগবে! কত জল খাবে তুমি অনুপ? দেবযানী বলল।

—অনেক। অনুপম হাসল।

মুরলী লোকটার কাঁধে বাকি ডাবগুলো চাপিয়ে চলে গেল। বলে গেল, যাবার সময় দরকার হলে সে আবার ছাড়িয়ে দেবে তাদের।

অনুপম হাসল, ঠিক আছে। আমার তো লাগবেই মুল্লিদা। ভালই জানো সেটা।

এবার নিরিবিলি গাছের ছায়ায় বসে দুজনে ডাব ফুটিয়ে খেতে

থাকে।

বেশ বড় বড় সাইজের শীতের ডাব। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখটা গোল করে কেটে একটা দেবযানীকে দিল। বলল, খেয়ে দেখ ঝিনিদি, কী মিষ্টি তোমার গাছের এই ডাবগুলো।

তৃষ্ণার্ত দেবযানী বাধ্য মেয়ের মতোই কাঁপা কাঁপা ফর্সা হাতে ভারি ডাবটায় মুখ লাগায়।

অনুপ ততক্ষণে একসঙ্গে পরপর দুটো খেয়ে ফেলল। পরে রুমালে মুখ মুছে বলল, আঃ, দারুণ! কী ঝিনিদি ভাল নয়?

দেবযানী ডাবে মুখ লাগিয়ে খেতে পারে না। অভ্যেস নেই। বিব্রত চোখে তাকায় অনুপের দিকে। বুকের ওপর, গলায় জল গড়িয়ে পড়ছে। কাপড়টা ভিজেই গেল খানিক।

—আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি—

ডাবটা হাতে নিয়ে অনুপ এবার ছুরি ঘুরিয়ে প্রায় গ্লাশের মতো বড় মুখ তৈরি করে দিল। ধারগুলো চেঁছেও দেয় মসৃণ করে।

বলল, এবার একধারে মুখ লাগিয়ে চুমুক দাও। আমারই ভুল। আসলে তোমার জন্যে একটা স্ট্র আনা উচিত ছিল। তাই নয়?

—না না, দেবযানী হাসল লাজুক ভঙ্গিতে, এই তো সুন্দর। বেশ মজা লাগে।

তারপর বেশ সহজেই মুখ লাগিয়ে তৃপ্তি করে খেতে থাকে।

—ফাইন! দ্যাটস লাইক আ গুড গার্ল! আর একটা খাবে?

—ইয়েস। দাও—।

হঠাৎ যেন বেশ মজা পেয়ে যায় দেবযানী। পুকুর পাড়ে নারকেল গাছের নীচে জলের ধারে বসে এমন মুখ লাগিয়ে গাছের ডাব পেড়ে খাওয়ার অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। উপভোগ করে যেন ব্যাপারটা। আর তেমনি ভাল লাগে তেষ্টার মুখে জলটা খেতে।

অনুপ আর একটা এগিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। কেটে কেটে মুখটা আবার তেমনি গ্লাশের মতো বড়ো করে দিয়েছে।

বলল, নাও ঝিনিদি। এই ধারের দিকে মুখ লাগাও, তাহলে আর পড়বে না।

একটু হেসে আবার দুহাতে ধরে চুমুক দিল দেবযানী।

জলপানের মৃদু শব্দ তেমনি। মসৃণ কণ্ঠনালীটা তিরতির

করে কাঁপে। সুতোর মতো সরু একটা জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে গলা বেয়ে। বুকের দিকেই নেমে আসছে ধীরে ধীরে। স্ফীত বক্ষ যুগলের মৃদু ওঠা নামা··· ।

কিন্তু না, এবারে আর পারল না দেবযানী। অনেক জল ডাবটায়। একসঙ্গে এতখানি জল খাওয়া অসম্ভব। খানিকটা খেয়েই তাই ফেলে দিতে গেল ছুঁড়ে।

—আরে, আরে! অনুপম বাধা দিল, ফেলবে কেন, এমন সুন্দর জল? দাও বাকিটা আমি শেষ করে দিচ্ছি।

—সে-কি? এটা কেন খাবে তুমি, ছিঃ ছিঃ—। দেবযানী বাধা দেয়।

কিন্তু অনুপম শুনল না। হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই বাকি জলটা ঢক্‌ঢক্‌ করে প্রায় এক নিঃশ্বাসে শুষে নেয়।

পরে মুখ মুছতে মুছতে বলল, মাথা খারাপ, এমন সুন্দর মিষ্টি জল, ফেলতে আছে কখনও? না পারলে, অনুপ তো তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে—একবার বলবে তো?

অদ্ভুত এক অস্বস্তি আর লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিল দেবযানী। কিছুই অসম্ভব নয় অনুপমের পক্ষে। কিছুই অসম্ভব নয়··· ।

১২

বেলা শেষ হয়ে এল প্রায়।

বাগানের সীমানা ছাড়িয়ে মেটে রাস্তা ধরে আর একটু এগোলেই গঙ্গা। দূর থেকেই খোলা আকাশটা চোখে পড়ে গাছগাছালির আড়ালে। ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সেখানে এসেই দাঁড়িয়ে গেল দুজনে।

সামনে প্রসারিত ভরা নদী। স্রোতের শব্দ কুলকুল করে। বিকেলের হাওয়ায় ছোট ছোট ঢেউ ভাঙছে। ছবির মতো ঝাপসা গাছপালা ওধারে। দূরে একখানা পাল তোলা নৌকো। তরতর করে ভেসে যাচ্ছে স্রোতের টানে।

অনুপম তখনও এক নাগাড়ে কথা বলে চলেছে। বাগান খামার নিয়ে তার নানারকম জল্পনা। আরও নতুন নতুন পরিকল্পনা।

দেবযানী কোনও জবাব দেয় না। চুপচাপ শুধু শুনে যাচ্ছিল। তার দৃষ্টি তখন বিকেলের নদীর দিকে। কানে জলের শব্দ ছল ছল করে বাজে।

কিন্তু অনুপমও হঠাৎ চুপ হয়ে গেল এবার। সামনেই যেন দিগন্ত বিস্তৃত এক থমথমে নীরবতা। তার মধ্যে বেলা শেষের সোনালি আলোয় ঝলমল করে বয়ে চলেছে ভরা নদী। অপূর্ব। চোখ ফেরে না যেন। দেবযানীর দেখাদেখি সেও চুপ হয়ে যায়

হু হু করা এক উদাস হাওয়ার শব্দ তাদের চারদিকে।

দেবযানীর মনে পড়ছিল অন্য আর একটা দিনের কথা। সেদিনও দুজনে এমনি এসেছিল গঙ্গার ধারে বেড়াতে। মোটরবাইক থেকে নেমে তারপর তাদের সেই আশ্চর্য ভ্রমণ গঙ্গাবক্ষে। সূর্য ডুবে আসছিল তখন। সেই রক্তিম সন্ধ্যায় দুখিয়াবাবার জল সমাধি তাদের চোখের সামনে। চারদিকে কোলাহল। সমবেত ভজন কীর্তনের সুরে ভরে ওঠা নদী…কথা বলতে পারছিল একটাও। চাপা দুঃখের ভারে টনটন করে মন…

তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন মাঝি উঠে এল ঘাট থেকে। অনুপমের দিকে মৃদু হেসে মাথা নুইয়ে বলল, নৌকো নেবেন বাবু? ঘুরিয়ে আনব ভেতরে?

অনুপম দেবযানীর দিকে তাকাল। এখনও তেমনি চুপচাপ।

বলল, যাবে ঝিনিদি? চলো না, একটু ঘুরে আসি। ভাল লাগবে তোমার।

দেবযানী মাথা নাড়ল, নাহ্! এখানেই তো বেশ লাগছে।

—ও। তবে থাক। অনুপম যেন হতাশ হল একটু।

মাঝি দাঁড়িয়েই থাকে সামনে। অপেক্ষা করে, যদি সিদ্ধান্তের বদল হয় কোনও।

স্রোতের সঙ্গে একদল সাদা পাখি হাঁসের মতো ভেসে চলেছে।

অনুপমের নজর এখন সেদিকেই। খুব উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ করছে। ওপরের আকাশে আরও একদল। ডাকতে ডাকতে তারাও নেমে এল নদীর জলে। স্রোতের মধ্যে মালার মতো ভাসছে এখন দলটা।

দৃশ্যটা দেখতে দেখতে অনুপমের চোখ মুখ যেন ঝিকমিক করে জ্বলে। সে আর একবার তাকাল দেবযানীর দিকে। কিছু যেন বলতে চায়। অথচ ঠিক বলতেও পারছে না।

দেবযানী হাসল সামান্য, ঠিক আছে। চলো অনুপ ঘুরেই আসি একটু। কী বলো?

—যাবে সত্যি? সঙ্গে সঙ্গেই যেন লাফিয়ে ওঠে অনুপম।

মাঝির কাঁধে হাত লাগিয়ে বলল, চলো মাঝি ভাই, আর দেরি নয়। সন্ধের আগে আগেই কিন্তু ফিরব আমরা—।

নৌকোয় উঠে প্রায় ছেলেমানুষের মতো উৎফুল্ল হয়ে ওঠে অনুপম।

বারবার বলে, ভাল লাগছে না তোমার, ঝিনিদি? ওপারের দিকটা দেখ, কি সুন্দর!

দেবযানী মৃদু হেসে মাথাটা হেলায়, খুব সুন্দর—।

অনুপম হঠাৎ মাঝির বাচ্চা ছেলেটাকে বলল, এই তুই সর দাঁড় থেকে। আমিই টানব এবার।

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকাল, আপনি পারবেন বাবু?

—নিশ্চয়! অনুপম চোখ ঘুরিয়ে বলে, তুই কী ভাবিস আমাকে? দ্যাখ না তাকিয়ে তোর চেয়ে ভাল, না খারাপ পারি—।

দেবযানী হাসিমুখে চুপচাপ অনুপমের কাণ্ডটা দেখে। ভালও লাগে যেন একটু।

খুব উৎসাহ নিয়ে ছেলেমানুষের মতোই শরীরটা সামনে পিছনে দোলাতে দোলাতে দাঁড় টানছে অনুপম। পুলওভারটা গুটনো ওপরে। সবল হাতের শিরাগুলো টান টান। বেশ জোর দিয়েই টানছে ও। তবু মুখে একগাল হাসি। যেন খুব মজা লাগছে।

হঠাৎ একবার এলোমেলো জল ছিটিয়ে ছেলেটার সঙ্গে রহস্য করে খানিক।

বলল, এই, কেমন হচ্ছে রে?

—উহুঁ। ভাল না।

—আচ্ছা, এইবার? দু হাতে চেপে জল বাধিয়ে টানে সে।

—এইবার ঠিক হচ্ছে।

—তবে ? হা-হা করে খোলা গলায় হাসে অনুপম।

দেখাদেখি ছেলেটাও হাসে তার সঙ্গে।

অনুপম বলল, এই তোর নাম কী রে ?

ছেলেটা বলল, অতুল।

—বাহ্! অ—তুল! তার মানে তোর কোনও তুলনা নেই ? সাবাস!

ছেলেটা হাসল। বলল, আপনার নাম ?

—তুই তো বেশ চালু ছেলে আছিস রে! অনুপ রহস্য করে চোখ নাচায়। পরে হাসতে হাসতে বলল, আমি অনুপম। আমারও তুলনা নেই। আমাদের দুজনের একই নাম। বন্ধুও বলতে পারিস তোর। বুঝলি ?

ছেলেটা আবার হেসে উঠল। পছন্দ করে যেন অনুপকে বেশ।

হালে বসা মাঝিও হাসছে মিটিমিটি ওদের দিকে তাকিয়ে।

প্রায় মাঝ নদীতে পড়েছে নৌকো। জলটা এখানে অনেক শান্ত।

অনুপম দাঁড়টা হঠাৎ ছেড়ে দিল অতুলকে।

বলল, নে এবার তুই টান। আমি একটু বসি।

পাখির একটা নতুন ঝাঁক দেখতে পেয়েছে সে। সামনেই আকাশে ঢেউয়ের মতো দোল খেয়ে উঠছে নামছে। সিঁসিক্ সিঁসিক্ করা এক অদ্ভুত ডাকের শব্দ হাওয়ায়। পাখিগুলো হয়তো তাঁর চেনা। দাঁড় ছেড়ে দিয়ে তাই একমনে লক্ষ করে তাদের।

মাঝ নদীতে এসে দেবযানীও যেন নিষ্পন্দ এখন। কথা বলতে চায়। অথচ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। চারদিকে এক বিরাট শূন্যতা। সবকিছুই যেন অর্থহীন তার মধ্যে। কোথা থেকে ঘূর্ণির মতো হু হু হাওয়া। তার চুল এলোমেলো, আঁচলটা উড়তে থাকে। বুকের জমাট ভারটাও যেন সহসা উড়ে যেতে চায় তার সঙ্গে সঙ্গে।

নৌকোটা উঠছে, নামছে···দুপাশে জলের শব্দ, ছলাৎ ছলাৎ··· আকাশে বেলা শেষের মায়াবী সোনা রঙ···তার মধ্যে কোথায় কত-দূরে ভেসে চলেছে সে···বুকের মধ্যে জলের শব্দ···টলমল করা এক কাঁপন ধরানো অনুভূতি···

অনুপম হঠাৎ বলে উঠল পাশ থেকে, ঝিনিদি একটা গান

গাইবে ? গাও না, প্লিজ—

দেবযানী অবাক। চমক ভেঙ্গে ফিরে তাকায় অনুপমের দিকে। এ কি অদ্ভুত আবদার তার ?

কিন্তু না, নিতান্তই সরল আর ছেলেমানুষি ভঙ্গি মুখে। সেই ভাবেই তাকিয়ে আছে তার দিকে। হাওয়ায় ঝাঁকড়া চুলগুলো ভেঙ্গে পড়েছে কপালের ওপর। চোখে অবুঝ আবেগভরা দৃষ্টি !

হয়তো না জেনেই সে বলেছে। তবু মন কেমন করে দেবযানীর। এই মুহূর্তে বিমুখ করতেও যেন ইচ্ছে হয় না অনুপমকে। কিন্তু কী করে সে গাইবে ? গলাটা যে বুজে আসছে।

একটু ম্লান হাসি ফোটে মুখে। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল দুপাশে। পরে বলল, তুমিই গাও না একটা অনুপ, আমি শুনি। অনেকদিন তোমার গান শুনিনি।

অনুপম আর কিছু বলে না। দূরের নদীর দিকে দেখতে থাকে চুপচাপ।

পরে সেইভাবেই হঠাৎ গেয়ে উঠল এক সময়—

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে-এ-
তোমার খোলা হাওয়া-আ-

খুব আবেগ ভরে গায় অনুপ। আবেগের টানে কথাগুলো যেন তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। মন উদাস করে দেয় দেবযানীর।

অতুলের চোখ দুটো চকচকে। যেন এক নতুন চোখে দেখছে সে বাবুকে।

অনুপম আকাশে মুখ তুলে গেয়েই চলে ঃ

সকাল আমার গেল মিছে, বিকেল যে যায় তারি পিছে গো-ও…
রেখো না আর, বেঁধো না আর কূলের কাছাকাছি।
মাঝির লাগি আছি জাগি সকল রাত্রিবেলা
ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে করে কেবল খেলা-আ

উদাস বাউল সুরের আবেশে তন্ময় হয়ে মাথা নাড়ে অনুপম। চোখ দুটো আধবোজা। গভীর আবেগে আকাশ, বাতাস, আর নদীর এই খোলা পরিবেশের সঙ্গে যেন অদ্ভুতভাবে মানিয়ে যাচ্ছে গানটা!

ছোট অতুলকেও যেন খুব নাড়া দেয় অনুপম। ভাবুকের মতো সে সব ভুলে বাবুর গানটা শুনছে। দাঁড়টানা বন্ধ রেখেই সমানে মাথা দোলাচ্ছে তালে তালে। মেঠো সুরের আমেজ সহজেই হয়তো প্রভাবিত করে তাকে।

তারপর গানটা শেষ হতেই বলে ওঠে, বাঃ বাবু, খুব ভাল। উৎফুল্ল হয়ে একবার গুন গুন করে সুরটাও ভাঁজতে চেষ্টা করে।

অনুপম উৎসাহ দেয়, আচ্ছা! তুইও তো গান জানিস দেখছি! গা দেখি আমার সঙ্গে। নে, শুরু কর—তোমার খোলা হাওয়া-আ....

সঙ্গে সঙ্গেই গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠল অতুল। বেশ গলা! অনেকটাই সুর মিলিয়ে শুনিয়ে গেল। প্রতিভা আছে ছেলেটার।

অনুপম ওর পিঠ চাপড়ায়।

—সাবাস অতুল! সত্যি তোর কোনও তুলনা নেই। এতদিনে অবশেষে একটা শিষ্য জুটল আমার।

অতুল হি হি করে হাসে আনন্দে। আর লজ্জায়। খুব খুশি যেন।

দেবযানীও না হেসে পারে না।

ওপারে পৌঁছতেই সূর্যটা আড়ালে চলে গেল। ঝাঁকড়া বটগাছের মাথায় মিহি বিকেলের আলো।

বটগাছের নীচেই ঘাটের পাশে নৌকোটা দাঁড় করাল মাঝি। খুব চা খাবার ইচ্ছে হচ্ছে অনুপমের।

নৌকোটা বাঁধতেই বলল, চলো না ঝিনিদি। একটু ঘুরে দেখে আসবে এদিকটা। ওই সঙ্গে চা-ও খেয়ে নেবে এক কাপ?

—না অনুপম। তুমিই ঘুরে এসো।

দেবযানী নামতে চায় না। সে বরং অপেক্ষা করবে এই নদীর ওপর। তারপর এখান থেকেই ফিরে যাবে।

অগত্যা অতুলকেই ধরল অনুপম।

—কিরে ওস্তাদ, তুই পারবি না? ঘাটের ওপর থেকে আমাদের জন্যে দুকাপ চা এনে দিতে?

—হ্যাঁ বাবু, পারব। পয়সা দেন, আমি নে আসতেছি। এক কথায় রাজি অতুল।

—ভাল হওয়া চাই কিন্তু, আর গরম।

—ইস্‌পিশাল চা আনব?

—না না তুই সাধারণ চা-ই আন। আর সঙ্গে কি পাওয়া যাবে এখানে, খাবার মতো?

—অনেকঁকিছু পাওয়া যাবে। ঘুগনি, ফুরুলি, চানাচুর, মোয়া, আলুর চপ···

—ব্যস ব্যস ক্ষ্যামা দে, আর চাই না। তুই বরং আমাদের জন্যে এক প্যাকেট ভাল বিস্কুট নিয়ে আয়। তাতেই হবে। আর এই নে এইটা তোর জন্যে, কিছু কিনে খাবি তোরা।

—ঠিক আছে বাবু। আমি তাহলে যাই?

হঠাৎ কি ভেবে সে দেবযানীর দিকে তাকায়। বোধ হয় তারও অনুমতিটা নেওয়া প্রয়োজন মনো করল।

দেবযানী মৃদু হাসল, হ্যাঁ এসো। সাবধানে নামবে।

পরক্ষণেই এক লাফে নীচে নেমে গেল অতুল। উৎসাহে টগবগ করছে যেন সে।

ছেলেটাকে এইভাবে তাদের চা আনতে পাঠানো, ঠিক পছন্দ হয় না দেবযানীর। কেমন লাগে যেন ব্যাপারটা। তবু মেনে নিতে হয়। অনুপমকে বিমুখ করতে ইচ্ছে হয় না এই মুহূর্তে। হয়তো খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভোরবেলায় সেই কতদূর থেকে ছুটে এসেছে। খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়। বেচারি!

দেখতে দেখতেই অতুল ফিরে এল। হাতে কাগজ ঢাকা দুটো চায়ের গ্লাস। সঙ্গে তার বয়সি একটা বাচ্চা মেয়েকেও জুটিয়ে এনেছে। তার হাতে বিস্কুটের প্যাকেট। গ্লাস দুটো খালি হলে মেয়েটাই নিয়ে যাবে। অতুলকে আর উঠতে হবে না। একেবারে আটঘাট বাঁধা পাকা কাজ তার।

অনুপম আর একবার তারিফ করে, সাবাস অতুল! তোর মাথায় সত্যি বুদ্ধি আছে। নে, এই বিস্কুটগুলো তোরা ভাগ করে নে।

—না বাবু, আপনারা খান। অতুল লজ্জায় হাত গুটিয়ে নেয়।

—এই চোপ, যা বলছি শোন্।

দেবযানীও হাসে ওর লজ্জা দেখে। বলল, নাও না অতুল। কোনও দোষ হবে না এতে। আমি বলছি।

অগত্যা গুটি গুটি হাত বাড়াল ছেলেটা।

অনুপম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, বাহ্ বেশ চা। খেয়ে দেখ ঝিনিদি, অতুল এত মেহনত করে নিয়ে এল আমাদের জন্যে, খুব একটা ফেলনা নয় কিন্তু। অন্তত গরম তো আছে।

অতুল বুক ফুলিয়ে বলল, খান, মহেশদার দোকানের চা। সবচেয়ে ভাল।

—তবে? স্বয়ং মহেশদার দোকানের চা। আর চিন্তা নেই তাহলে। একবার খেলে আবার আসতে হবে এখানে।

দেবযানী ভ্রূ তুলে হাসল, সত্যি, তুমিও অতুলের চেয়ে কিছু কম নও। দুজনেই সমান।

—তার মানে, আমি আবার কী করলাম?

—কেন, ফেরার পথে স্টেশনের স্টলে বসে খেলে চলত না? খাবার পেতে সেখানে, পেট ভরাবার মতো কিছু।

—সেটা কিন্তু আমিও ভেবেছি ঝিনিদি।

—তাহলে?

—আশ্চর্য, সেখানে আর একবার বসব। তার জন্যে কী আছে। তাই বলে এটাই বা ছাড়ব কেন? এই বিকেলের নদীর ওপর নৌকোয় বসে খাওয়া, এর একটা আলাদা চার্ম। এই পরিবেশে সবকিছুই যেন আলাদা রকম। এমন কি মহেশদার এই ঘন দুধের চা-টাও। তোমার মনে হচ্ছে না? দেখবে, একটু পরেই মনে হবে—।

দেবযানী নিরুত্তর।

কথাটা হয়তো রহস্য করেই বলছে অনুপম। তবু ভিতরে

ভিতরে চাপা যেন অন্যরকম কোনও সংকেত! বুকের মধ্যে গুরু-গুরু করে দেবযানীর। এই বিকেলের নদীর সবকিছুই যে দুঃখময় তার কাছে!

সবুজ পায়রার মতো এক ঝাঁক পাখি উড়ে এল মাথার ওপর। ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। সুন্দর দেখতে লাগছে দৃশ্যটা!

অনুপম বলল, হরিয়াল! রোদ্দুরে রঙটা কী রকম ঝিমমিক করেছে দেখ। বিউটিফুল!

নৌকোর ছইয়ে ঠেসান দিয়ে একটা হাত কোমরে রেখে কথা বলছে অনুপম। পিছনে আকাশ জুড়ে ঘন আবির রঙ। সবুজ পুলওভারে মোড়া তার দীর্ঘ দেহেও সেই আভা। চোখে মুখে এক অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের ছবি। অনুপম বড় হয়ে গেছে। কেমন যেন অচেনা লাগছে দেখতে···

কথা বলতে বলতে একবার ঘাড় বাঁকাল তার দিকে। স্থির মুগ্ধ দৃষ্টি। যেন এক অন্য অনুপম।

দেবযানী অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

১৩

এবার ফেরার পালা তাদের।

ঘাট ছাড়িয়ে ছপ্‌ছপ্‌ করে এগিয়ে চলে নৌকো। জোয়ারের জল নেমে এসেছে অনেক। ডুবে থাকা গাছের শিকড়গুলো জেগে উঠছে একটু একটু করে। গাছতলায় সেই চায়ের দোকানের মেয়েটা হয়তো এসে দাঁড়িয়েছে আবার। তাদের চলে যাওয়া দেখছে এক দৃষ্টিতে।

অনুপমেরও নজর তার দিকে।

চুপচাপ বসে আছে সে ছইয়ের কানায় হেলান দিয়ে। পাশে দেবযানী। অনেকদূর পর্যন্ত ঘাটটা দেখা যায়। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। তবু ঝাঁকড়া বট গাছটা ঠিক চোখে পড়ে। তলায় দাঁড়ানো মেয়েটা আর নেই। এখন সেখানে শুধু অন্ধকার।

পাশ দিয়ে তীব্র ভট্‌ভট্‌ শব্দ তুলে লোক বোঝাই একটা মোটর লঞ্চ বেরিয়ে যাচ্ছে। নজর পড়ে দেবযানীর। সুন্দর সাদা আর

নীল রঙের একটা বোট। বড় একটা চোখ আঁকা সামনের দিকে। ঘন ভ্রূ আর পল্লবে ঢাকা আয়ত চক্ষু। দৃষ্টি পড়বেই সেদিকে। কিন্তু ওটা কার চোখ? কোন বিশেষ নারীর? না, এই জলযানের নিজের? ঠিক বোঝা যায় না।

চোখে পড়ল, লোকগুলো সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে এদিকে। দৃষ্টিগুলো ভাল নয়। স্থূল ইঙ্গিত করে কী সব বলাবলিও করছে তার উদ্দেশ্যে। দেবযানী ভ্রূক্ষেপ করে না। গম্ভীর মুখে আকাশের দিকে দেখে।

লঞ্চটা মুহূর্তের মধ্যেই বেরিয়ে চলে গেল। বড় বড় ঢেউ উঠল নদীতে এবার। নৌকোটা দুলতে থাকে। টালমাটাল হয়ে ঢেউয়ের মাথায় লাফিয়ে ওঠে।

দেবযানী ভয়ে জড়োসড়ো হঠাৎ। শরীরটা ভীষণ দুলছে এলোমেলো হয়ে। টাল সামলাতে না পেরে অনুপমকেই জড়িয়ে ধরল একবার। বুকের মধ্যে ঝিমঝিম করে ওঠে কেমন।

—একি! ঝিনিদি! ভয় করছে তোমার?

শব্দ করে হেসে উঠল অনুপম, কোন ভয় নেই। এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে। লঞ্চটা গেল না? তার ঢেউ। ঠিক আছে আমাকে ধরে থাকো তুমি—।

দেবযানী হাসল করুণ দৃষ্টিতে।

চড়া ভাঁটার টান ধরছে জলে এবার। তার সঙ্গে সাঁ সাঁ করে হাওয়া। শান্ত নদীটা চঞ্চল হয়ে উঠল। নৌকোটা অনেক বেশি দুলছে এখন। দুপাশে ক্রমাগত ঢেউ ভাঙার শব্দ।

কিন্তু দেবযানী স্থির। কাটিয়ে ফেলেছে ভয়টা যেন। দুলতে দুলতেই দেখছে সামনের দিকে।

অতুল ঝপ্‌ঝপ্‌ করে দাঁড় টানছে। আরও বেশি জোর লাগে এখন। স্রোতের উল্টোদিকে চলেছে নৌকো। তবু ফূর্তির ভাবটা লেগে আছে মুখে।

একবার বলল, বাবু বৈঠা ধরবেন?

—না রে।

—আর ইচ্ছে করছে না?

—না। ভাবুকের মতো মাথা নাড়ল অনুপম।

আকাশ লাল করে ওদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পাখিরা ফিরে যাচ্ছে বাসায় দল বেঁধে। এখন সেই দিকেই দৃষ্টি।

দেবযানীও দেখছে। নৌকোর দুপাশে একটানা জলের শব্দ। জোলো হাওয়ায় শীতের ধার। চাদরটা জড়িয়ে নিল গায়ে। নৌকোটা ঢেউয়ের মধ্যে লাফাচ্ছে আবার। খেয়াল করে না।

তার চোখের সামনে এখন এক অপরূপ মায়াবী আলোয় ভরে উঠছে আকাশ। গাছপালা, মাঠ, নদী' সবার চোখে-মুখেও সেই রঙ। আশ্চর্য! রোজই হয়তো এমন করে সূর্যাস্ত হয় এখানে। অথচ কেউ খেয়াল করে না।

মনটা টনটন করে দেবযানীর। কী অদ্ভুত লাগে তার সবকিছু এই মুহূর্তে! কতদূরে ফেলে আসা এক নদীর কথা মনে পড়ে যায়! বারবার মনে পড়ে···

মাঝনদীতে এসে আবার অতুল গুনগুন করে সুরে ভাঁজে খানিক। মাথা দোলায় নিজের মনে।

একবার অনুপমকে বলল, বাবু, আর একটা গান ধরেন আপনি।

অনুপম কোনও উত্তর দেয় না। কী ভাবছে যেন।

অতুল আবার বলে, বাবু, একটা গান—

—যাঃ! আবার কি! একবার তো শোনালাম। এবার তুই গা—।

মাঝিও সমর্থন করে ছেলেকে ধরেন না বাবু। আর একখানা ধরেন, বড় ভাল লেগেছিল গানটা।

—বাঃ, তাই নাকি?

লাজুক হাসি অনুপমের মুখে। আড়চোখে একবার দেবযানীর দিকে দেখল।

দেবযানীও হাসছে মিটিমিটি। মাথা দুলিয়ে বলল, লজ্জা কি, করো না আর একখানা। শ্রোতারা যখন চাইছে—

—আর তুমি?

—হ্যাঁ আমিও। গাও অনুপ—

অনুপম একটু ভাবে। আকাশের লাল রঙটা আরও গাঢ় এখন। প্রায় অন্ধকার নদীর ওপার। আর একটু পরেই আজ চাঁদ উঠবে। অন্ধকার গাছপালার আড়ালে তার ফিকে আভা। একটু একটু করে ফুটে উঠছে।

দেখতে দেখতেই সে গেয়ে উঠল নিজের মনে,

ও চাঁদ—চোখের জলের লাগল জোয়ার—দুখের পারাবারে…

বুকের মধ্যে কোথা থেকে যেন একটা ঢেউ আছড়ে পড়ে এসে দেবযানীর! এ যে সুমনের বড় প্রিয় গান! কতবার কটেজে বসে শুনিয়েছে তাকে। চাঁদ উঠলেই এই গানটার কথা মনে পড়ে যেত। সুমনের নিজের গানের গলা ছিল না। কিন্তু পছন্দ ছিল সবার সেরা। তন্ময় হয়ে বসে শুনত এই গানটা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত অদ্ভুত এক দৃষ্টি মেলে।

আশ্চর্য! অনুপম কি জেনেশুনেই এই গানটা গাইছে! অসহ্য অস্থিরতায় বুকের মধ্যে তোলপাড় হয়ে চলে।

গানটা বোধ হয় আর পুরো মনে করতে পারছে না অনুপম… না, পারছে না। প্রথম লাইন দুটোই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইছে। আশ্চর্য! সে একবার ধরিয়ে দেবে কি? কথাগুলো যে মুখে এসে যাচ্ছে, …ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে—

আমার তরী ছিল চেনার কূলে…বাঁধন যে তার গেল খুলে…

ছড়টানা করুণ বেহালার মতো সুরটাও বাজে বুক জুড়ে। কাঁপে ঝিনঝিন করে চারপাশে। তবু এই মুহূর্তে দেবযানী তাকে কোনও সাহায্য করতে পারে না। পারে কি…

কিন্তু অনুপম নিজেই পারল। সুরের ঝোঁকে একসময় ঠিক খুঁজে পেল পরের কথাগুলো। এবার আবেগে আরও ভরাট হয়ে উঠতে থাকে তার গলা! কাজগুলো অবশ্য ঠিক ফোটে না। তবু সব ঢেকে দেয় দরদ দিয়ে। এক অদ্ভুত দরদে এই খোলা নদীর বুকে সে যেন জীবন্ত করে তুলছে গানের কথাগুলোকে। বা, অনুপ বাহ্!

নৌকা পাড়ি ধরল বাগানের দিকে। অতুলের মুখে কথা নেই। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে পাড়ে। সেই দিকেই মুখ করে বৈঠা টেনে চলেছে ওরা। একটানা তার ছপছপ শব্দ।

ফিরতে হয়তো বড় দেরি হয়ে গেল। এমনটা আগে ভাবেনি দেবী। সব যেন কী রকম ওলোটপালোট হয়ে গেল আজ। কাকেই বা বলবে।

অনুপম মুখ ঘুরিয়ে বসেছে বাগানের দিকে। সেই ভাবেই চলেছে তার গান গাওয়া। আর কোনও দিকে খেয়াল নেই।

বাগানটা ক্রমশ স্পষ্ট এখন। সীমানার কাছে আকাশে মাথা তুলে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে দেবদারু আর শিরীষের সারি। গোল চাঁদের মুখ দেখা যায় আড়ালে। গাছগুলো যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে চাঁদের আলোয়। অবাক লাগে দেবযানীর। তার সামনে কুয়াশামাখা নীল চাঁদের আলো। জমাট নিস্তব্ধ বনভূমি। সবকিছুই যেন নিঃস্পন্দ হয়ে গান শুনছে।

এই সুর কি তার কানেও পৌঁছচ্ছে? সুমন্ত্রের কানে?

অবশ ঘোরের মধ্যে কথাটা ভেবে হঠাৎ নাড়া খেয়ে ওঠে দেবযানী।

আস্তে আস্তে বাগানের ঘাটে এসে ভিড়ল নৌকোটা।

অতুল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে পড়ে। বলল, দাঁড়ান বাবু, এখন নামবেন না। কাদা—।

ভাঁটিতে চর জেগে উঠেছে। জল নেমে গিয়ে এখন চারদিকে থিকথিকে কাদা। খানা খোঁদল। জ্যোৎস্নার আলোছায়া পড়ে আরও অচেনা লাগছে সব। পা দেবার শুকনো জমি মেলে না একটুও।

অতুল নৌকোটা টেনে যতটা সম্ভব ওপরে তোলে। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয় না। কোথায় শুকনো ডাঙা! অনুপম নজর করতে থাকে ভাল করে।

চারদিকে ছোপ ছোপ জল আর কাদা। মাঝেমধ্যে ইটের টুকরো আর খণ্ড খণ্ড পাথরও দেখা যায়। অনেককাল আগে হয়তো একটা ঘাট ছিল কখনো। তার চিহ্ন কিছু। অনুপম এবার হাত

বাড়িয়ে দিল।

—এসো ঝিনিদি, আমার হাত ধরে এসো। পাথর দেখে দেখে খুব সাবধানে পা ফেলো আমার সঙ্গে। না না, পড়বে না, কোনও ভয় নেই।

অগত্যা তার হাতটা আঁকড়ে ধরেই পা টিপে টিপে ওপরে উঠতে থাকে দেবযানী। মাঝে মাঝে টাল খেয়ে পড়ে। পা পড়ে না ঠিকমতো। আবছা আলোর মধ্যে দেখতেও পায় না স্পষ্ট। অনুপম প্রতিবারই সামলে দেয়। আড়াল করে নিজের পুরো শরীরটা দিয়ে।

সেই নরম উলের ঘম পুলওভার! ভুল হওয়া সম্ভব নয় তার কখনও। তবু হয়। তার ওপর পড়তেই যেন চমক লাগে দেবযানীর। কী তাজা এক নতুন গন্ধের ঝলক! নতুন উষ্ণতার ভাপ্!

পুরনো সেই গন্ধটা কোথায় চাপা পড়ে গেছে! আর হয়তো কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাবতে কষ্ট লাগে এখন।

এক অদ্ভুত শূন্যতায় ফাঁকা হয়ে আসে দেবযানীর মন।

বাগানের পথে কুয়াশা মাখা আবছা চাঁদের আলো। তার মধ্যে মাথা নিচু করে চুপচাপ পথ হেঁটে চলে ওরা। কথা বলতে ইচ্ছে করে না যেন। চারদিকের গাছগাছালি, প্রান্তর এক রহস্যময় রূপ ধরেছে এখন। নীলচে কুয়াশার চাদরে ঢেকে যাচ্ছে সবজি ক্ষেতগুলো।

দূরে কোথায় অনুপমের সেই ব্রেইন ফিবার পাখির ডাক। কাছেই কোথাও, খুবই স্পষ্ট সুরটা। অনুপম নিশ্চয় শুনছে কান পেতে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিল অনুপ। মনে করলে অবিকল যেন কথার মতোই শোনা যায়ঃ পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা!

শনশনে হাওয়া উঠেছে বাগানে। তার সঙ্গেই ভেসে বেড়াচ্ছে সুরটা। যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তার প্রিয়তমকে।

পাখিটাকে এখন খুব পরিচিত লাগে দেবযানীর। অত্যন্ত নিজের বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। শুধু পাখিটাই নয়—এই মুহূর্তে

এখানকার গাছপালা, ক্ষেত, মাঠ, সবজি বাগান—সব কিছুই একান্ত আপন বলে মনে হয়। চারদিক থেকে এর প্রতিটি শব্দ, গন্ধ, অবয়ব আর নিস্তব্ধতা গভীরভাবে জড়িয়ে ধরছে তাকে।

চলতে চলতে বারবার ফিরে তাকায়। হয়তো এই শেষ! আর কখনও দেখা হবে না।

যখন এসেছিল, চনমনে দুপুরের রোদে মাথা তুলে সবাই অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাকে। আর, এখন এক উদাসীন বিষণ্ণতায় থমথমে হয়ে আছে। পায়ের কাছে বি-ই-প, বি-ই-প ধ্বনি কোন্ অজানা পতঙ্গের।

নিস্তব্ধতা ভেঙে অনুপম হঠাৎ বলে উঠল।

—ঝিনিদি, তুমি তো আমায় বললে না কিছু।

—কী বলব অনুপ?

—তুমি রাজী কিনা আমায়, মানে এই বাগানটা রাখতে।

—ছিঃ! ওভাবে বলছ কেন অনুপ। করুণ চোখে তাকাল দেবযানী।

পিছনে আকুল হয়ে উঠেছে ব্রেইন ফিবারের ডাকটা। পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা। অনুপমের চোখে-মুখে ঝাপসা জ্যোৎস্নার আলো। তার মধ্যেও চোখে পড়ে চকচকে দৃষ্টি। এই মুহূর্তেই সে যেন একটা কিছু জবাব চায়।

সোজাসুজি চোখে চোখ রেখে তাকায়, তবু তুমি একটা কিছু বল ঝিনিদি। প্লিজ—

বুকের মধ্যে পতঙ্গের ধ্বনিই বাজে। ঘুরপাক খায়। বি-ই-প, বি-ই-প!

দেবযানী মাথা নাড়ল, আমি,…আমি যে কিছুই ঠিক করতে পারছি না ভেবে…

—জানি। ভাবনাটা এবার আমার পরে ছেড়ে দেবে?

বুকের মধ্যে আবার পতঙ্গটা ডাকে। উড়ছে ফরফর করে। আচ্ছন্নের মতো বলে ওঠে দেবযানী, বেশ। তাই দিলাম।

—থ্যাংক ইউ! আবেগে উদ্ভাসিত অনুপমের মুখ। দু হাত তুলে উৎফুল্ল হয়ে বলতে থাকল, ব্যস, তুমি আর কিছু ভেব না ঝিনিদি! এখন থেকে সব দায়িত্বই আমার! আমি আবার সব

কিছু ঠিকঠাক করে গড়ে তুলব···কথা দিচ্ছি তোমাকে···

—তাই করো অনুপ!

গলাটা বুজে এলো দেবযানীর। হঠাৎ আবেগে তার হাত দুটো কখন জড়িয়ে ধরেছে অনুপ···উষ্ণ ছটফটে অনুপম···

বলছে উচ্ছ্বসিত হয়ে, না, আমি কোনওদিন দুঃখ দেব না তোমাকে। কথা দিলাম, ঝিনিদি···বরাবর পাশে থাকব···তুমি দেখো···ঠিক দেখে নিও, অনুপম তোমাকে ছেড়ে যাবে না কখনও···

বুকের মধ্যে উদ্দাম হয়ে বাজে সেই অদ্ভুত ধ্বনি। সমস্ত শরীর যেন অবশ দেবযানীর! বড় অসহায় আর অরক্ষিত লাগে নিজেকে এই মুহূর্তে!

অনুপম ক্রমশ আরও জোরে আকর্ষণ করছে তাকে। ছটফট করছে কথা বলতে বলতে···তীব্র সেই উষ্ণ গন্ধের ঝলক···আগুনের মতো নিঃশ্বাস···

ঝরঝর করে চোখে জল নামে দেবযানীর। যেন কতদিনের জমানো কান্না! বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো বেরিয়ে আসছে।

অনুপম চমকে গেল।

অপ্রস্তুত হয়ে বলল, এ কি ঝিনিদি? কী হল তোমার!

সেইভাবেই তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে।

চোখের জল তবু থামে না দেবযানীর। কেন যে এতদিন পর এমন অবাধ হয়ে উঠল আবার, সে নিজেই জানে না!

অনুপম মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ঝাপসা চাঁদের আলোর মধ্যে নিস্তব্ধ দুটো ছায়ামূর্তি। অজস্র ঝিঁঝির ডাক চারদিক থেকে।

অনুপম আস্তে আস্তে বলল, ঝিনিদি—তুমি কি রাগ করলে আমার ওপর?

—না অনুপ, না···

ধরা গলায় বারবার মাথা নাড়তে থাকে দেবযানী। শরীরটা এখনও কাঁপে থরথর করে।

—তবে এসো।

আগের মতোই তাকে ধরে নিয়ে পথ চলতে শুরু করে অনুপম। নীল জ্যোৎস্নায় ঢাকা এক ধু ধু নির্জন মেঠো পথ।

দেখতে দেখতেই অনেকটা দূর এগিয়ে গেল। সামনেই দেবযানী কটেজ। হাল্কা কুয়াশার ঘোরে ঢাকা এখন। ছায়াভরা নিস্তব্ধ আমবাগান। মৌরি ক্ষেত। সব পিছনে পড়ে থাকে।

ঝির ঝির করে দমকা হাওয়া বইল হঠাৎ। পিছন থেকেই যেন ছুটে আসে। প্রথম বসন্তের হাওয়া। শিশির ভেজা টলটলে দেবদারু গাছগুলো দুলছে। তাজা ঘ্রাণ আন্দোলিত বনভূমির। কতদূর থেকে ছুটে আসছে!

খোলা মাঠের মধ্যে এসে আর একবার দাঁড়িয়ে পড়ল অনুপম। আবার যেন কিছু বলতে চায়।

চারিদিকে নীল কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না। ঝিঁঝির ডাক। দেবযানী তাকিয়ে থাকে। কিন্তু কিছু বলল না সে।

বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করতে থাকে দেবযানীর। কতদিন সে অনুপকে থামিয়ে রাখবে এমন করে। কী করে ফিরিয়ে দেবে তার ব্যাকুল হাত দুটো? আজ হোক, কাল হোক, কথাটা তো সে স্পষ্ট করেই বলবে একদিন। তখন?

তখন তাকে কী বলবে দেবযানী?

সুমন্ত্র তুমি কী চাও?…

মাথার মধ্যে টাল খেয়ে যায় কথাটা ভাবতে ভাবতে।

দেবযানীর মনে হল, অনুপম একা নয়। এই বাগানের প্রতিটি গাছগাছালি, ক্ষেত-খামার, কীট-পতঙ্গ, এমন কি সুমন্ত্রও বুঝি তার মুখে এই উত্তরটা শুনবার জন্যে, অপেক্ষা করে আছে।

কতদিন আর সে এই দায়টা এড়িয়ে থাকতে পারবে।